প্রকাশক
মহানাম সম্প্রদায়
মহাউদ্ধারণ মঠ
৫৯, মানিকতলা মেইন রোড,
কলিকাতা ৫৪

প্রথম সংস্করণ শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীপঞ্চমী ১৩৪৪

মুদ্রাকর—
অবিনাশ রায় এম. এ
শান্তি প্রেস
১, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড
কলিকাতা-১১

উড়িষ্যান্তর্গত ঢেঙ্কানাল রাজ্যের

ভক্তিমতী

রাজমাত

আমার

পরম প্রীত্যাস্পদা

রাণী

শ্রীশ্রীমতী কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া দেবী

বাণী-বিজয়ের এই (প্রথম) সংস্করণের

সমগ্র ব্যয়ভার গ্রহণ করায়

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

শ্রীভগবানের নিকট

তাঁহাদের

চিরকল্যাণ

কামনা

করি।

শ্রীজীবনবালা দেবী

আরতি

আরতি তোমার আগে,
(ওগো) আৰ্ত্তি তোমার আগে ;
জ্বলুক আমার হৃদয়-প্রদীপ
তব প্রেম-অনুরাগে !
জাগুক জীবনে পলকে পলকে
তোমার মূরতি আরতি-আলোকে
শশীর কিরণ অসির ফলকে
যেমন ঝলকি' জাগে !
এ নয় আরতি ; আৰ্ত্তি আমার
লুটাইছে ওই চরণে তোমার,
কভু মুখ চাহি করুণাধারার
শুধু এক কণা মাগে !
কর আলোকিত আমার হৃদয়
আরতির মত, ওগো, দয়াময়,
আঁধার এ প্রাণে জাগে শত ভয়,
পদে পদে ব্যথা লাগে ।
(ওগো) আরতি তোমার আগে :

প্রেমমঞ্জরী

প্রথম সংস্করণের

প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি

'বাণী-বিজয়' প্রকাশ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমার শ্রীবৃন্দাবনে পড়িয়া থাকা সার্থক হইল।

পরম ভক্ত মহাকবি শ্রীশ্রীজয়দেবের মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ অবলম্বনে 'বাণী-বিজয়' রচিত হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় দয়া করিয়া এই কাব্য-গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সদিচ্ছায়, আগ্রহে, উৎসাহে এবং আশীর্ব্বাদে বাণী-বিজয় আজ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইতে পারিল। বাণী-বিজয়ের ঋণ তাঁহার নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তিনি যে ভাবে এই বাণী-বিজয় আস্বাদন করিয়াছেন এবং যে ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, সে কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

বাণী-বিজয়-রচয়িত্রী পূজ্যা শ্রীমতী জীবনবালা দেবী এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-লীলার মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীজয়দেবের পবিত্র চরিত্র-চিত্রাঙ্কন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ইনি অতি অপূর্ব্ব প্রকারে গীত-গোবিন্দ আস্বাদন পূর্ব্বক অতি অভিনব উপায়ে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।— বাণীর ইচ্ছা হইয়াছিল যে, অখিলরূপ-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পূর্ণরূপে ভাষায় ব্যক্ত করিবেন। অনেক পরিশ্রমের ফলে এক কণামাত্র ব্যক্ত হইল। বাণী অবশেষে

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাই কবি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন—"বাণী-বিজয়।"

৺পুরীধামে সন ১৩১৬ সালে বাণী-বিজয়ের জন্ম হয়। সন ১৩৩৫ সালে, শিবপুরে বাণী বিজয়ের পাণ্ডুলিপি হঠাৎ অদৃশ্য হয়। যে দুই চারি লাইন স্মরণ ছিল, উপকরণস্বরূপে তাহাই লইয়া কবি নবীন উদ্যমে পুনরায় বাণী-বিজয় রচনায় প্রবৃত্তা হন। এবারে বাণী-বিজয়ের কলেবর প্রায় চতুর্গুণ বৰ্দ্ধিত হয়। বৃন্দাবনে আসিয়া শিবপুরের বাণী-বিজয় সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বৰ্ত্তমান অবয়ব লাভ করিয়াছে। ইহাই বাণী-বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অনেকগুলি অসুবিধাবশতঃ এই সংস্করণে বাণী-বিজয়ের আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারা গেল না। প্রাকৃত-নায়ক-নায়িকা-ঘটিত কোন কাব্য হইলে, এই ত্রুটি গ্রন্থের বহুল প্রচারের পথে কণ্টকস্বরূপ হইত; কিন্তু বাণী-বিজয় সম্বন্ধে সে আশঙ্কা একেবারেই নাই। ভগবৎ-অধরামৃত-লোলুপ ভক্তবৃন্দের সম্মুখে পুরাতন পর্ণপুটেও শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ পরিবেশন করা চলে। ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়াই কৃতার্থ হন; আধারের নিন্দা করা দূরে থাক, যে পাত্র এই দেববাঞ্ছিত মহাপ্রসাদ বুকে ধরিয়া আনিয়া মুখে তুলিয়া দিল, অতি হীন হইলেও মহাপ্রসাদস্পৃষ্ট সেই অকিঞ্চিৎকর পাত্রকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বারম্বার প্রণাম করেন। এইটুকুই বাণী-বিজয়ের

ভরসা। ফুলের পাতায় (দলে) হাওয়ায় উড়িয়া পড়া ধূলা মাটি দেখিয়াই কি মধুলোভী মধুকর ফুলের অন্তর্নিহিত রসাস্বাদনে বিরত হইবে? সে যাহা হোক, ব্রজসুন্দরের ব্রজলীলা গাথা ব্রজের বনে রচিত (সম্পূর্ণীকৃত), মুদ্রিত এবং ব্রজের বন হইতেই প্রকাশিত ইহা আমাদের পক্ষে কম আনন্দের বিষয় নহে।

অযোগ্য প্রকাশকের হাতে পড়িয়া বাণী-বিজয়ের অনেক দুর্দ্দশা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার ভুল ও ত্রুটির জন্য দায়ী আমার অনভিজ্ঞতা, অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও ভাগ্যহীনতা।

অনেক ভুল ত্রুটি থাকা সত্বেও, যে মহাপুরুষের নাম বুকে ধরিয়া বাণী-বিজয় আজ পরীক্ষিত হইবার জন্য মহামানবের সভার এককোণে অতি দীনবেশে, শঙ্কান্বিত হৃদয়ে, কম্পিতপদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার কিঞ্চিৎ কৃপা হইলে এই পরীক্ষার ফল ভালই হইবে, এ আশা দুরাশা নয়।—সেই মহাভক্ত মহাকবি শ্রীশ্রীজয়দেবের শ্রীচরণ কমলে আমরা প্রণাম করি। ইতি—

শ্রীবৃন্দাবন।
সন ১৩৪৪

প্রণত
শ্রীকালিদাস দত্ত

উৎসর্গ

—⁘০⁘—

হে, মাতঃ হে মনস্বিনী, হোমাগ্নিউত্থিতা
তেজঃশক্তি স্বাহাসমা বিশ্বহিত তরে
আচরিলে চিরব্রত, স্বার্থবিবর্জ্জিতা
পরার্থে, সার্থক জন্ম লভি ধরাপরে।

ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মে করি একত্র মিলন
সেবিলে সংসার লয়ে জীবসেবা-ব্রত;
সন্ন্যাসিনী, তবু স্তন্যক্ষীরে এ জীবন
রেখেছ, জননি, বিশ্বজননীর মত!

জগদ্ধাত্রী গায়ত্রীর গৈরিক প্রতিভা-
মণ্ডিতা, মধ্যাহ্নরবিসম তেজস্বিনী,
জ্ঞানে গার্গীসমা, গুণে মূর্ত্তিমতী শিবা;
বাগ্মিতায় বাণীসমা বাক্যবিনোদিনী

মুছাতে আর্ত্তের অশ্রু মূর্ত্তা দয়া তুমি,
এসেছিলে দুর্গতের দুর্গতি হরিতে ;
ধন্যা সে জননী, আর সেই জন্মভূমি—
সম্ভবা হইলে যথা, হে, পূতচরিতে !

অভয়ে, ভয়ার্ত্তে দয়া স্বভাব তোমার,
নিজ অন্নগ্রাস তুলি দিয়াছ অপরে,
সর্ব্বস্ব বিলায়ে রিক্তা, তবু চমৎকার
নিশ্চিন্ত-নির্ভর নিত্য ছিলে ধরা'পরে।

সদানন্দময়ী তুমি সম্পদে বিপদে,
গীতার আদর্শ ভক্তা ঈর্ষামর্ষহীনা ;
হরিপ্রেমে মত্তা, মগ্না নাম-সুধা-নদে,
বীরত্বমণ্ডিতা, তবু বৈষ্ণবী-সুদীনা।

কি যশঃ বর্ণিব তব, চির-যশস্বিনী,
তুমি মহীয়সী, তুমি তোমার উপমা ;
আরাধ্যা যোগাদ্যা-মূর্ত্তি, হে মোর জননি
নারীর গরিমা তুমি শিব-শক্তিসমা।

জ্ঞান-গুরু—শিক্ষয়িত্রী তুমি মোর দেবি,
দেহ শিক্ষা আশৈশব আপন কৃপায় ;
কিন্তু দাসী ভাগ্যদোষে ও' চরণ সেবি
ঘুচাতে পারেনি নিজ দীনতা ধরায়।

ভাগবতধর্ম্ম পালি গিয়াছ চলিয়া
দেখায়ে ভক্তির পথ আদর্শে আপন—
গতিশক্তিহীনা আমি, তাই মা, বসিয়া
পথোপরি করি ভক্ত-চরিত-কীর্ত্তন।

যদি দয়া হয় কারো, নিবে হাত ধরি,
করিবে সাথের সাথী নিজকৃপাগুণে ;
পঙ্গুরেও অঙ্গীকার করিবেন হরি
নিজদাস মুখে এর দীন দশা শুনে।

শ্রীগীত-গোবিন্দ, আর জয়দেব কবি
তব চিরপ্রিয়, তাহা দেখিয়াছি আমি।
এ 'বাণী-বিজয়ে' তাই আঁকি সেই ছবি
দিতেছি শ্রীকরে তব হয়ে প্রীতিকামী।

অস্পষ্ট এ চিত্র, তবু তুমিই ইহার
করিবে যতন, তাহা জানি ভালমতে ;
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-রহঃলীলা রস-সার—
মর্ত্তের মানবী তাহা পারে কি আঁকিতে।

নিষ্ফল এ চেষ্টা মোর, তবুও এ লেখা
কেন—কিবা হেতু, তাহা কিছুই না জানি ;
শক্তি নাই একবিন্দু, নাই ভক্তিরেখা,
তবু এ মূকের মুখে কে ফুটায় বাণী ?

যে কুহকী যাদুমন্ত্রে করিল পাগল,
ভাঙ্গা যন্ত্রে সেই যন্ত্রী বাজাল এ সুর ;
এ 'বাণী-বিজয়' ছুঁয়ে তারি পদতল,
রসহীন হইলেও হবে সুমধুর।

নমি পদে, লও দেবি, এ নির্ম্মাল্য আসি ;
তুমি তৃপ্তা হইলেই ধন্যা হবে দাসী।

শ্রীবৃন্দাবন।
শ্রীপঞ্চমী
সন ১৩৪৪

চির-চরণাশ্রিতা
দীনা কন্যা

দুটি কথা

ত্রিশ বছর পূর্ব্বে দিল্লী সহরে কালীমন্দিরে ভাগবত পাঠ করিতেছিলাম। অবস্থান করিতেছিলাম বন্ধুবর নিত্যরঞ্জন গুপ্তের বাসায় কেরোলবাগে। তাহার ঘরে এই বাণী-বিজয় গ্রন্থখানি প্রথমে হাতে আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাঠ করিয়া ফেলিলাম। মনে হইল যেন রসের সিন্ধুতে অবগাহন করিলাম।

বন্ধুবর নিত্যরঞ্জনের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলাম গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীবৃন্দাবনে ভজনে আছেন। দিল্লীর কাজ শেষ করিয়া বৃন্দাবন গেলাম। অনেক অনুসন্ধান করিয়া হাড়াবাড়ীকুঞ্জে লেখিকা জীবনবালা দেবীর সাক্ষাৎকার পাইলাম।

স্নেহে, কারুণ্যে, বিদ্যাবত্তায়, ভজনতন্ময়তায় এমন একটি মাতৃমূর্ত্তি আর দেখি নাই। "মা" বলিয়া ডাকিলাম! পুত্রস্নেহে আদর করিলেন। পরে বহুবার তাঁহার ভজনময় জীবনের সান্নিধ্য পাইয়াছি। যতই নিকটতর হইয়াছি ততই মুগ্ধ হইয়াছি— তাঁহার গাম্ভীর্য্যে ঔদার্য্যে ও লীলাস্বাদন মাধুর্য্যে।

মা জীবনের অধিকাংশ সময় নিত্যলীলা স্মরণে থাকিতেন। এখন মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া নিত্যলীলাতেই ডুবিয়া গিয়াছেন। যাইবার কালে আমাকে বলিয়াছিলেন—বাণী-বিজয় তুমি এত ভালবাসিয়াছ এজন্য এ গ্রন্থখানি তোমাকে দিলাম তুমি আর একবার ছাপিও।

দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে মাতৃআদেশ পালিত হয় নাই।

আজ সেই ভাগ্য হইল। দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ভাগ্যলাভে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীচম্পালাল আঞ্চালিয়া মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণ ব্যয় বহন করিয়াছেন। তাঁর সহৃদয়তায় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীর শ্রীচরণে তাঁর ও পরিবারস্থ সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

মা যেমনটি লিখিয়াছিলেন তেমনটিই ছাপাইলাম। একটু পরিবর্দ্ধন করিলাম গ্রন্থের নামটির। নাম ছিল বাণী-বিজয়। আমি তার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছি "কবি জয়দেবের বিজয়-বাণী।" আশা করি ইহাতে মাধুর্য্য কিছু ক্ষুণ্ণ হইল এরূপ কিছু নিত্যলীলাগতা মা মনে করিবেন না।

মা! তোমার গ্রন্থ তোমাকেই দিলাম, নিত্যলীলা হইতে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গ্রহণ কর। আশীর্ব্বাদ কর যেন শ্রীগুরুমুখ প্রার্থনা জীবনে সার্থক হয়।

"বন্ধু বন্ধু গীতি কুঞ্জ-সেবা-স্মৃতি
স্ফুরুক হৃদে নিরন্তর।

তোমার আদরের

মহানাম

ভূমিকা

শ্রীমতী জীবনবালা দেবী অমর কবি জয়দেবের শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ পাঠ করিয়া এই গ্রন্থে কবিবরের যে ভাবছবি দেখিতে পান, সেই চিত্র তাঁহার হৃদয়ে নব নব কাব্যভাবের সৃষ্টি করিয়া দেয়। তিনি এই গ্রন্থে তদীয় গীত-গোবিন্দ অধ্যয়নের ফল-জনিত বিবিধ মৌলিক কাব্যরসের ঘনীভূত বিবিধ চিত্র প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থ আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। আমি অতি বিস্মিতভাবে এই গ্রন্থের আদ্যান্ত শুনিয়াছি।

শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থের সমাদর কোন সময়ে ভারতবর্ষে অত্যধিক ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। বহু বহু রসজ্ঞ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় ইহার টীকা করিয়াছেন। আমি নিজে এই গ্রন্থের তেতাল্লিশখানি সংস্কৃত টীকার নাম জানিতে পারিয়াছি। আমার অনুমান হয়, আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, ইহার সংস্কৃত টীকার সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। জর্ম্মান পণ্ডিত আউফ্রেক্ট সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের যে তালিকা করিয়াছেন, আমি আমার সম্পাদিত গীত-গোবিন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় গীত-গোবিন্দ টীকাকারগণের নাম উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। এতদ্দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতবর্ষীয় কাব্যরসাভিজ্ঞ সংস্কৃতভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে এই গ্রন্থের সমাদর কত অধিক ছিল। বর্ত্তমান সময়েও

ইয়োরোপ, এ্যামেরিকা প্রভৃতি দেশবাসী পণ্ডিতগণও বিবিধ ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। আর্‌বী, পার্শী ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় নানাবিধ ভাষাতেও এই গ্রন্থের গদ্যে পদ্যে অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষাতেও গদ্যে পদ্যে এই গ্রন্থের বহু অনুবাদ হইয়াছে। আমি নিজেও অনেক অনুবাদ দেখিয়াছি, গদ্যে অনুবাদ করিয়াছি এবং মাসিক পত্রিকাদিতেও এতদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু শ্রীমতী জীবনবালা দেবীর এই "বাণী-বিজয়" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শ্রবণ করিয়া আমি প্রকৃতপক্ষে বিস্মিত হইয়াছি। ইঁহার গ্রন্থখানি পদ্য ছন্দে লিখিত। আমি ইহার কি আখ্যা দিয়া ব্যাখ্যা করিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইহা কি গীত-গোবিন্দের পদ্যময়ী ব্যাখ্যা, অথবা তচ্ছন্দে বিরচিত ভাষ্য, কিংবা ভাবানুগত তাৎপর্য্য-প্রকাশিকা সুবিস্তৃত টীকা; কিংবা পদ্যানুবাদমূলক স্বাধীন, স্বতন্ত্র, সরস, সুন্দর, মধুর, কান্ত-পদাবলী-সমন্বিত ছন্দ-মাধুর্য্যে বিরচিত একখানি অভিনব অভিরাম গ্রন্থ—ইহার কোনও সংজ্ঞাতেই এই গ্রন্থখানিকে খ্যাতীভূত করিতে পারিতেছি না। অনেকেই শ্রীগীত-গোবিন্দ পাঠ করিয়াছেন এবং এতদ্‌সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপভাবে শ্রীগীত-গোবিন্দের মর্ম্মোদ্ঘাটন আর কেহ কখনও করিয়াছেন কি না তাহা আমি অবগত নহি। নিজে কবি না হইলে কাব্যের মর্ম্মে প্রবেশের অধিকার

জন্মে না ; কবিরসবিবর্জ্জিত হৃদয়ের কাব্যরসাস্বাদপ্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ শ্রীগীত-গোবিন্দের অভূতপূর্ব্ব শব্দালঙ্কারপূর্ণ অলৌকিক মধুররসাশ্রিত শ্রীবৃন্দাবনীয় কাব্যরসে প্রবেশাধিকার লাভ বহু বহু জন্মের সুকৃতি ভিন্ন সম্ভবপর নহে। "বাণী-বিজয়" কাব্য শ্রবণে আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, গীত-গোবিন্দ পাঠে এই গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়ে যে পরম কৃপারূপা মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিতা হইয়াছে, এই গ্রন্থের প্রতি পত্রে তাহার উত্তাল তরঙ্গ-চিত্র পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

লৌকিক কাব্যের কবিগণ সংস্কৃতভাষায় যে-সকল কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতি আলঙ্কারিক গ্রন্থের মাপ্‌কাঠিতে সেই সকল কাব্যের বিচার চলিতে পারে ; কিন্তু গীত-গোবিন্দ মহাকাব্যের বিচার প্রণালী তাদৃশভাবে নির্ণিত হইতে পারে না। এই কাব্যের স্থান—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবন। উহা প্রেমিক ভক্তের মহাধ্যানের বস্তু। ইহার নায়ক—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ, নায়িকা—মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা। ইহার বিষয়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উন্নত-উজ্জ্বল-রসময় লীলা-বিলাস। সুতরাং ইহা লৌকিক কাব্যের ন্যায় নহে। লৌকিকসাহিত্যের পারদর্শী সাহিত্যবিদ্‌গণের আলোচনার বহু ঊর্দ্ধে এই মহাকাব্যের স্থান। স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ তদীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলায় শ্রীগম্ভীরা মন্দিরের নিভৃত কক্ষে তদীয় অভিন্নহৃদয় সহচর শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর

ও শ্রীপাদ রামানন্দের সহিত দিন-যামিনী এই কাব্যের রসাস্বাদ করিতেন। এই অলৌকিক অমৃতময় মহাকাব্যের অন্তরালে যে কত উচ্চ রসধারাসুধা প্রবাহিত হইতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

শ্রীমতী জীবনবালা দেবীর উচ্চ রসগ্রাহী হৃদয়ে এই মহাকাব্যের যে গূঢ় গম্ভীর ভাবরাশি উন্মেষিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তিনি তৎপ্রণীত এই "বাণী-বিজয়" কাব্যে তাহারই কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রেমিক কবি জয়দেব যে দিব্য নেত্রে শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দর্শন করিয়াছেন, তিনি যে প্রগাঢ় ভাবরসময় ধ্যানে এই মহীয়সী অলৌকিক ব্রজরসলীলা অনুভব করিয়াছেন; "বাণী-বিজয়" প্রণেত্রী তাহারই চিত্র তদীয় গ্রন্থে প্রকটিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবিবর যে ছন্দে ও যে রাগরাগিণীতে তাঁহার হৃদয়গত ভাব প্রকটন করিয়াছেন, শ্রীমতী জীবনবালা দেবী তদীয় বাণী-বিজয় কাব্যে তাহারও বিচার, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাবরাজ্যের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কবিবর যেরূপ কল্পনা কৌশলে বিচরণ করিয়াছেন, "বাণী-বিজয়" কাব্যে আমরা তাহারও সুস্পষ্ট আভাষ দেখিতে পাই। আমি "বাণী-বিজয়" কাব্য হইতে ইঁহার এই সকল উক্তির উদাহরণ দিতে প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে প্রেমোন্মাদের একটি লক্ষণ লিখিত আছে। উহা এই :—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

ইহাই অলৌকিক প্রেম-বিকারের লক্ষণ। ইহাকে দিব্যোন্মাদও বলা যায়। বাণী-বিজয়-গ্রন্থকর্ত্রী বুঝিয়াছেন যে, জয়দেব প্রেমবিকারের দিব্যোন্মাদগ্রস্ত না হইলে শ্রীগীত-গোবিন্দের ন্যায় মহাকাব্য তাঁহার পক্ষে রচনা করা অসম্ভব। শ্রীপাদ জয়দেব এই ভাবে বিভাবিত হইয়াই শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

"দেখি এ রঙ্গ, প্রেমতরঙ্গে ভাসায়ে অঙ্গখানি,
কভু হাসে, কভু কাঁদে জয়দেব—স্তম্ভিতা তাহে বাণী।"

ফলতঃ প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত কাব্যের রাজ্য অনেক উচ্চে অবস্থিত। সেই রাজ্যে চিত্ত উন্নীত না হইলে কাব্যের প্রকৃত ভাব অভিব্যক্ত হয় না। এই অবস্থায় কবিকে অনেক পরিমাণে উন্মত্তের ন্যায় কাব্য রাজ্যে বিচরণ করিতে হয়।

নিত্যব্রজরসের কবি শ্রীপাদ জয়দেব যে দিব্য নেত্রে শ্রীবৃন্দাবনের বাসন্তীশ্রী ও তদুত্থ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সুষমাময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এ জগতে তাহার স্থান নাই। উহা অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়, কেবলই ধ্যানগম্য। তাই শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষি লিখিয়াছেন—"ধ্যায়েৎ বৃন্দাবনং রম্যং" ইত্যাদি।

এই সকল উক্তির অন্তে লিখিত হইয়াছে—"ন দৃশ্যং চর্ম্ম-চক্ষুষা" অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রসবিলাসস্থল শ্রীবৃন্দাবন আমাদের চর্ম্মচক্ষুর দৃশ্য নহে। উহা এক অলৌকিক অমৃতময় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের নিত্য নিকেতন। জয়দেব রচিত শ্রীবৃন্দাবনের বাসন্তকুঞ্জবর্ণন পাঠ করিলেই বুঝা যায়—অলৌকিক রাজ্যের কবিশক্তিসম্পন্ন না হইলে, এ জগতের ভাবে ও ভাষায় এমন সুন্দর, সরস ও সুমধুব রসময় লীলার উপযুক্ত দৃশ্যস্থলীর সৌন্দর্য্য প্রদর্শন অপরের পক্ষে অসম্ভব। এইরূপ শব্দ সম্পদ্, শাব্দিক ললিত বৈভব, ব্রজরসের মহাসৌন্দর্য্য শ্রীপাদ জয়দেবের কবিত্বে যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, ভারতীয় অন্য কোন কবির লেখনীতে কুত্রাপি সেরূপ বর্ণিত হয় নাই।

শ্রীমতী জীবনবালা দেবী তাঁহার বাণী-বিজয় গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জয়দেবের কাব্যের অনুবাদ বা ভাষান্তর করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি সে বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পান নাই, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য অন্যরূপ। শ্রীপাদ জয়দেব ভাব রাজ্যের উচ্চতম গ্রামে অবস্থান করিয়া বাসন্তী পিক-বধূর ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্য-সুধাময়ী সঙ্গীতলহরী স্বপ্নরাজ্যের আনন্দপ্রবাহের ন্যায় ইহলোকে প্রবাহিত করিয়াছেন। তিনি (জীবনবালা দেবী) সেই গূঢ়-গম্ভীর সুধামধুর ভাবরাশির উন্মেষ, উদ্গম ও প্রবর্দ্ধনের আধ্যাত্মিক নিয়ম প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে প্রচেষ্টায়

একদিকে যেমন দার্শনিকতার সূক্ষ্ম তথ্য নিহিত আছে, অপরদিকে তেমনি আবার ভাব প্রস্ফুটনের বৈজ্ঞানিক ধারাও প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসার সূক্ষ্ম নেত্রে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারা এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমি পূর্ব্ব কথিত প্রতিজ্ঞানুসারে দুই একটি উদাহরণ দেখাইতেছি। কোন একস্থলে বাণী বিজয়ের রচয়িত্রী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া আমি তাঁহার কল্পনাধারার নূতনত্ব, মৌলিকত্ব এবং ভাবের প্রগাঢ়ত্ব ও চমৎকারিত্ব দেখাইতেছি। শ্রীগোবিন্দ বহুবল্লভ—ইহা বৈষ্ণব কাব্যের অবিদিত নহে। তাদৃশ অপ্রাকৃত, অলৌকিক নায়ক বহুবল্লভ না হইলে মধুররসের পুষ্টি সাধন হয় না ; বৈচিত্র্যতারও অভাব ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের আতিশয্য সংঘটনের জন্য সময়ে সময়ে অদর্শন হইয়া থাকেন। এইরূপ অদর্শনের পারিভাষিক নাম বিপ্রলম্ভ বা বিরহ। পূর্ব্বরাগে, প্রবাসে ও গোষ্ঠে. এবং মানে ও অপরা নায়িকার সম্ভোগকালে শ্রীরাধার এই জ্বালাময় কৃষ্ণ-বিরহ সংঘটিত হইয়া থাকে। কোন নিশীথে শ্রীকৃষ্ণ যখন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বিহার করিতেছিলেন, শ্রীরাধা তখন কৃষ্ণ-বিরহে অধীরা হন। তাঁহার বিরহ-দুঃখ নিবারণের জন্য বৃন্দা চন্দ্রার কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ আনয়নার্থ গমন করেন ; কিন্তু যাইয়া দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাসহ মধুরসে প্রমত্ত। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ আনয়নের প্রচেষ্টাতে রসভঙ্গের আশঙ্কায় তিনি নীরবে শ্রীরাধার নিকট প্রত্যাগমন করেন। তিনি নিজে

রসভঙ্গের অপরাধিনী না হইয়া শ্রীরাধিকাকে বলেন—

"ধর পুরুষের বেশ ওগো প্যারি, আমরাও হই নর,
গিয়া সেই বেশে ধরি হৃষীকেশে কর পরকীয়া পর।"

ইহার এই উক্তির অন্তরালে অতর্কিতভাবে কলিতে শ্রীগৌর অবতারের আভাস সূচনা ও প্রকল্পিত হইতে পারে। সেই আভাসের ছায়া অতঃপরে স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। "কালে কালে হবে আরও অঘটন, এখনো কলির বাকি।" যাহা হউক, ইহার উত্তরে শ্রীরাধা—"বৃন্দারে ডাকি বলে, প্রাণসখি! নারী কি গো হয় নর? পুরুষ সজ্জা আমাদের তাই নহে সম্ভবপর।" এতদুত্তরে বৃন্দা যাহা বলেন তাহা এই :—

"বৃন্দা হাসিয়া বলে, "ওগো রাধে! চিন না নিজেকে নিজে,
যে দেয় স্বয়ং ব্রহ্মেরে রূপ, প্রকৃতি আকারে পূজে—
তার কিগো হয় রূপের অভাব? এই তিন লোক মাঝে
যা কিছু প্রকাশ সৃষ্ট বস্তু—তোমারিত ছায়া রাজে।
স্বয়ং প্রকৃতি ইচ্ছা-স্বরূপা—ইচ্ছাময়ী সে নাম,
ইচ্ছা মাত্রে প্রলয়, সৃষ্টি, স্থিত হয় তিন ধাম!
নিজের মায়ায় আজ বিমোহিতা, কহ বিমূঢ়ার প্রায়।
প্রবলা হইয়া ইচ্ছা প্রকাশ, যাহে নারী-ভাব যায়।"

এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে মহাশক্তিশালিনী আদ্যাপ্রকৃতির যে শক্তিসামর্থ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বেদবেদান্তের নিত্য শাশ্বতী শক্তি। যোগমায়ার সাহায্য ব্যতিরেকে লীলারসময়

রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে আত্মপ্রকটন করেন না। প্রকৃতি ভিন্ন সদাশিব শবরূপে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণের যে মহীয়সী মহালীলায় স্বয়ং যোগেশ্বর মহাদেব পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, তাহার মূলেও লীলারসপ্রচারিণী লীলাশক্তিস্বরূপিণী স্বয়ং মহাপ্রকৃতি মহামহেশ্বরী যোগমায়া! শ্রীকৃষ্ণের যত প্রকার শক্তি আছেন, তন্মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিসমূহের মূল মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধাই সর্ব্বপ্রধানা। যদি শ্রীমতী রাধার তত্ত্ব ও তাঁহার আবির্ভাব প্রকটিত না হইতেন, তাহা হইলে এ জগতে 'প্রেম-ভক্তি' এই শব্দটি বৃথা হইয়া যাইত। পরম তত্ত্ব যে আনন্দরসময়, ইহা কোন সাধকই বুঝিতে পারিতেন না। বৈদিক ঋষিরা পরম তত্ত্বকে বহুস্থানে বহুবার আনন্দময় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীরাধিকাসহ বৃন্দাবন-লীলা ঋষির হৃদয়ে অনুভূত না হইলে উপনিষদে 'আনন্দ' শব্দের অস্তিত্বই থাকে না।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে গ্রন্থ-রচয়িত্রীর অতীব চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ তথ্য প্রকটনের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"রাধা মনে মনে ভাব সম্বরণে হইল যত্নবতী,
সুদৃঢ় ভাবের পূর্ণ বিকাশে প্রকাশে নরের গতি।
ভাবময়ী রাধা ভাবে পায় রূপ, ভাবুক বিনা না জানে!
যে ফেরে ভাবের সন্ধানে সেই ভবভাবনের ধ্যানে,
সেই পায় কিছু আলোক তাহার, অন্যে দুরূহ অতি;
ভাবের মুকুরে বিশ্ব প্রকাশ—নতুবা কাঁচের গতি!

ভাব-বিপর্য্যয় দেখি শ্রীরাধার জয়দেব বাক্‌হারা,
সাধনা-রাজ্যে এই দর্শন—দর্শন মাঝে সেরা।"

এই বাণী-বিজয় গ্রন্থে স্থানে স্থানে কল্পনার অভিনব বৈচিত্র দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রার আলয় হইতে আনয়নের জন্য রচয়িত্রী শ্রীমতী রাধিকাকে বলরাম বেশে সাজাইয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে হয়ত কাহারও কাহারও মনে রসদুষ্টির আশঙ্কা হইতে পারে; উহা এই যে—চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমাগণের মধ্যে একতমা, এ অবস্থায়, তাঁহার গৃহে বলরামের প্রবেশ আপাত-দৃষ্টিতে রসবিরুদ্ধ বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দেশাচার ও লোকাচার অনুসারে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর বিলাসগৃহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রবেশ বিরুদ্ধভাবাপন্ন কার্য্য বলিয়াই স্বভাবতঃ মনে হয়। সুতরাং এই কল্পনা ভাবদুষ্ট ও রসদুষ্ট বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। এতদুত্তরে কবির কল্পনার অনুকূলে আমরা কবিবর কালিদাসের 'মেঘদূত' হইতে একটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া ইহাই বলিতে পারি যে, প্রেমাধিক্যের প্রভাবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচারের অপেক্ষা থাকে না। "কামার্ত্তাহি প্রকৃতিকৃপণা শ্চেতনাচেতনেষু।" 'মেঘদূত' কাব্যের নায়ক যক্ষ, প্রণয়িনী পত্নীর বিরহে এতই ব্যাকুল ও অধীর হইয়াছিলেন যে, অচেতন মেঘকে দূতরূপে তাঁহার প্রিয়তমার নিকটে তৎসংবাদ দানার্থে প্রেরণ করেন। প্রণয়ি-হৃদয় বিরহের আতিশয্যে স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র বিচারে সমর্থ

হয় না। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধা ও তৎসখীগণের চিত্ত এতই ব্যাকুল হইয়াছিল যে, ভাবতুষ্টি বা রসতুষ্টির বিচার তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় নাই। যে কোন উপায়েই হোক, শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে আনয়ন করা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল। যে কোন উপায়েই হোক, ইহাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থায় প্রায়শঃ বিচারের অপেক্ষা না থাকাই স্বাভাবিক।

বাণী-বিজয় কাব্যে, রচয়িত্রী শ্রীপাদ জয়দেবকে এবং তাঁহার রচিত গীত-গোবিন্দ কাব্যখানিকে যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। কাব্য অসাধারণ কল্পনারই সৃষ্টি। ভক্ত পূজক ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘটে অলৌকিক রূপ-লাবণ্যসম্পন্ন স্বীয় উপাস্য দেবের অধিষ্ঠান কল্পনাপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন। বাণী-বিজয় কাব্যের কল্পনাধারাও তাদৃশী। পরমাণুতে হিমালয়, বিন্দুতে সিন্ধু—অবাধ, অবাধ্য, অশাসিত ও অশাস্য প্রকল্পনারই অতি অদ্ভুত ফল। এই কাব্যে শ্রীমতী জীবনবালা দেবীর আরাধ্য ও আরাধিত কল্পনা তাঁহার মানস-চক্ষের সমক্ষে কবিবর জয়দেব ও তাঁহার কাব্যের যে অনন্যদৃষ্ট, অসাধারণ প্রতিচ্ছবি প্রদর্শিত করিয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষেই অনন্যদৃষ্ট, অভিনব স্বতন্ত্র কাব্য-বিশেষ। তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্র ব্যতীত ইহার অনেক বিষয়েরই সাক্ষ্য অন্যত্র সম্ভাবিত নহে। সুতরাং কল্পনার মুক্ত প্রগ্রহবৃত্তির

সাহায্যেই এই কাব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাতে অদ্ভুতত্ব আছে, নূতনত্ব আছে ও চমৎকারিত্ব আছে।

এই গ্রন্থে, মান অন্তে কলহান্তরিতা শ্রীরাধার বিলাপ অতীব মর্ম্মস্পর্শী। বঙ্গীয় মহাজনী পদাবলীতে কলহান্তরিতার পদগুলি যেরূপ সমুচ্চ ভাবসম্পন্ন ও হৃদয়বিদারক কোমল-করুণ-রসাত্মক এই গ্রন্থেও সেই ভাবের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়।

অতঃপরে নিত্যসিদ্ধা সখীগণের শ্রীশ্রীরাধা-প্রীতির ভাবপ্রবাহ বর্ণিত হইয়াছে। উহা বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির সুস্পষ্ট উদাহরণ। উহাতে ব্রজ-প্রেম-রসের সুদুর্লভ সন্ধান পরিদৃষ্ট হয়। সখী-হৃদয়ের কোমলতাময়ী সহানুভূতি, ভক্তিবিভাবিত পরমাপ্রীতি স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণনামে শ্রীমতী রাধার হৃদয়ে কিরূপ মহাভাবের সঞ্চার হয়, বাণী-বিজয় কাব্যে তাহার আভাস নিম্নলিখিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ-সম্মিলনের গত সুখ-স্মৃতি অনুধ্যান করিতে করিতে যখন একেবারে অধীরা ও ব্যাকুলা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন কি, যখন বিরহের নবম দশা অন্তে দশম দশায় অচেতন প্রায় হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়সখী তাঁহার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণ নাম শুনাইতেছিলেন। তদ্ যথা—

এক সুচতুরা আভীরকুমারী শ্রীমতীর পাশে বসি,
"কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" ডাকে আর বলে, "কোথা গোকুলের শশী।"

*   *   *   *

"কৃষ্ণ নামেতে কর্ষিত হল উদ্গতপ্রাণা রাধা,
উঘারি নেত্র কহে, "কৃষ" "কৃষ"—জড়িত শব্দ আধা।
কহে—"সহচরি! কি নাম শুনালি—কই কৃষ, কই কই?"
আমি যে জানি না এ তিন ভুবনে "কৃষ্ণ" এ নাম বই!
তাহা কি মধুর কৃষ্ণ বলিতে রসনা নৃত্য করে,
কোটি জিহ্বায় জপিলে সে নাম—তবু সাধ নাহি পুরে।"
যবে শুনি কানে কৃষ্ণের নাম, অর্ব্বুদ কান লাগি—
ডাকি বিধাতায়, নমি তাঁর পায় ঐ বরদান মাগি।
কৃষ্ণের স্মৃতি জাগিলে চিত্তে বিস্তৃত হয় বুক,
ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরে না সজনি!—এত সুখ! এত সুখ!
সর্ব্বেন্দ্রিয় চিত্ত রূপেতে হোক পরিণত মোর
কত সুধা-ঢালা এ দুই আখর!" বলি ঝরে আঁখি-লোর।

শ্রীরাধার কর্ণে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রবেশ করা মাত্রই নামের প্রভাবে তাঁর মৃতপ্রায় দেহে যেন নব প্রাণের সঞ্চার হইল। তাঁহার হৃদয়ে নব বলের সঞ্চার হইয়া ভাব-সমাধি হইতে যেন তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিল। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ-আরাধিকা রাধিকার পক্ষে নামের প্রভাব এমনই শক্তিশালী। উপরি-উক্ত ছত্র নিশ্চয় পাঠ বা শ্রবণমাত্রেই ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীরূপগোস্বামী রচিত "বিদগ্ধ মাধব" নাটকে লিখিত নাম-মাহাত্ম্যের প্রভাবসূচক একটি

সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকের ভাব স্পষ্টরূপেই স্ফুরিত হইয়া উঠিবে। উহা এই—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥"

এই পদ্যের ভাবার্থ উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিনিচয়ে ধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার গদ্যানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। এই সংস্কৃত পদ্যের বঙ্গানুবাদ, বঙ্গীয় কবি শ্রীমৎ যদুনন্দন ঠাকুর মহাশয়ের "বিদগ্ধ মাধব" নাটকের পদ্যে বঙ্গানুবাদে এইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা—"মুখে লইতে কৃষ্ণ নাম নাচে জিহ্বা অবিরাম" ইত্যাদি। ফলতঃ বাণী-বিজয়-গ্রন্থ-রচয়িত্রী তদীয় গ্রন্থে নাম-মাহাত্ম্যের এই অদ্ভুত প্রভাব বর্ণনা করিয়া বৈষ্ণব সাধকগণের উপাসনার একটি প্রধানতম উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসও শ্রীমতী রাধার উক্তিতে নাম-মাহাত্ম্যের এইরূপ প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"সখি! কেবা শুনাইল কৃষ্ণনাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মোর প্রাণ।" ইত্যাদি।

শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে নায়িকার প্রধান প্রধান অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। বাণী-বিজয়-রচয়িত্রী শ্রীপাদ জয়দেবের

কাব্যাবলম্বনে সেই সকল ভাবের উপযোগী বর্ণনা তদীয় গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। গোপীপ্রেমে মান একটি প্রধান ব্যাপার। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় একবার রথের সময়ে শ্রীপাদ স্বরূপের সহিত মহাপ্রভুর রসতত্ত্বের আলোচনা হয়। তখন মহাপ্রভু শ্রীপাদ স্বরূপের মুখে ব্রজগোপীদের মানের প্রসঙ্গ শুনিতে চাহেন, স্বরূপ তখন তাঁহাকে ব্রজগোপীগণের মানের বিবরণ শ্রবণ করাইয়া বলেন—"প্রভো! ব্রজগোপীগণের মান্ প্রকৃতপক্ষেই রসের নিদান।" দ্বারকার মহিষীগণের মধ্যে শ্রীমতী সত্যভামা ঠাকুরাণী অতীব মানময়ী, কিন্তু সে মানে ব্রজরসের স্ফূর্ত্তি নাই। ব্রজগোপীর মান প্রেমরসের এক অদ্ভুত বিচিত্র উচ্ছ্বাস। প্রেম তটিনীর স্রোত আপন বেগে প্রবাহিত হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে কারণে অকারণে সেই প্রেম-স্রোত স্বভাবতঃই বাধাপ্রাপ্ত হয়। নদীর স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইলে উহা যেমন উচ্ছ্বসিত, স্ফীত হইয়া তটিনীর বক্ষকে সমুচ্চ ও গৌরবান্বিত করিয়া তোলে, মানের বাধায় প্রেম-তটিনীরও সেই অবস্থা হইয়া উঠে। উহা প্রেমেরই সমুচ্চ, স্ফীত ও গৌরবান্বিত ভাব বিশেষ। এই মানের গতি সর্পের গতির ন্যায় কুটিল। কারণে অকারণে কোন্ কথায়, কোন্ সময়ে, কখন্ যে মানের উদয় হয়, তাহা বলা যায় না। "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে মানের বিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। উহা অতীব গবেষণাপূর্ণ। বাঙ্গালার পদকর্ত্তৃগণের অনেকেই শ্রীরাধার

মানের বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দের মানের বর্ণনায় অতি অদ্ভুত চমৎকারিত্ব আছে। শ্রীগোবিন্দ শ্রীমতীর মান-ভঞ্জনের বিবিধ প্রয়াস পাইয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্, দেহি পদ-পল্লব মুদারম্।" এই বিনীত প্রার্থনা করিয়া শ্রীমতীর শ্রীচরণ-পঙ্কজ আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন। এই ব্যাপার মান-রসের ইতিহাসে, বিশেষতঃ প্রেম-রসময় শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় অতি বিচিত্র! অতি মধুর! অতি অদ্ভুত! কিন্তু জনপ্রসিদ্ধি এই যে, শ্রীপাদ জয়দেব এতবড় একটা কথা নাকি স্বীয় হস্তে লিখিতে সাহস করেন নাই, উহা মহাপ্রেমিকা মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মানমর্যাদা-সংরক্ষণকুশল, অদ্বিতীয় প্রেমিক, "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতির ঘনীভূত মূর্ত্তি, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দই গীতগোবিন্দ গ্রন্থে ছদ্মবেশে স্বয়ং হস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কি কৌশলে এই ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বাণী-বিজয় কাব্য হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

"বাণীর সাধক পদ্মানায়ক, যেন সাধনার বলে ;
পেয়েছে পদ্মালয়ার অংশে পদ্মা-রূপিণী ফলে।
অবসাদহীনা, সস্মিতাননা—করে কাজ এক মনে,
হেনকালে কবি অস্নাত হয়ে ফিরে এল সেইখানে।
পদ্মা চমকি কহে, "নাথ! একি!—অস্নাত ফিরে এলে?
কিছু কি ভুলিয়া গিয়াছ ফেলিয়া পুষ্প তুলসীদলে?

কিংবা সহসা হলে অসুস্থ—শীঘ্র প্রকাশি কহ।"
কবি কহে হাসি, "পূর্ণ সুস্থ আছে প্রিয়ে মোর দেহ।
মাত্র কবিতা একটি চরণ স্মরণ হইল পথে,
পাছে ভুলে যাই, আসিলাম তাই কিছু দূরপথ হতে।
দাও পুঁথি আনি, লিখে পদখানি গৃহেই করিব স্নান;
পূজি তারপরে ইষ্টদেবেরে করিব ভোজন পান।"
পদ্মা হাসিয়া আনি দিল পুঁথি, লেখনী, মস্যাধার,
বলে, "নাথ! এবে কবিতার ভয়ে, গৃহে থাকা হল ভার।
শয়নে স্বপনে থাক তার ধ্যানে, ভোজনে স্নানেও বাধা,
একি কুহকিনী, মন্ত্রের জালে লাগায়েছে এই ধাধা।
এই যাদুকরী মোর ধন চুরি করিতে এসেছে বুঝি।"
কবি হাসি কহে, "ভয় নাই প্রিয়ে! হারালে আনিব খুঁজি।
প্রতিবিম্ব হেরি বৃথা কর ভয়, মুকুর সমুখে রাখি,
সে ত ভাব শুধু, তুমি যে স্বরূপ—এখনও বুঝিতে বাকী।
এ হৃদি-আলেখ্য—তার মাঝে তুমি, বাহিরেও তার তুমি;
ধরি নানাভাব বিভাবিত কর আমার হৃদয়-ভূমি।"
সলাজ হাসিয়া সস্মিতাননা রন্ধনশালে গেল,
পুঁথি খুলি কবি আঁকে প্রেম-ছবি বিচিত্র নিরমল;

গ্রন্থকারের মূল গ্রন্থে যেভাবে শ্রীরাধার মান ভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা ভক্ত কবির হৃদয়ে একেবারে উদিতই হইতে পারে না। ফলতঃ লোক-প্রসিদ্ধি এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কবি

জয়দেবের বেশ ধারণ করিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই বাক্য লিখিয়া গিয়াছেন।

যিনি অনন্ত কোটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, তিনি তাঁহার আরাধিকা ও সাধিকার মানভঙ্গের জন্য তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া তাঁহার চরণ-যুগল মস্তকে ধারণ করিতে প্রয়াসী—ব্রজ-রস-সাহিত্যে কোনও কবি এরূপভাবে ইতঃপূর্ব্বে মানভঙ্গের প্রয়াস তদীয় কাব্যে প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীপাদ জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে ইহাই এক প্রধান বিশিষ্টতা। কিন্তু বাণী-বিজয় কাব্যে এই ব্যাপার সাধনের জন্য যেভাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দকে কবির গৃহে সমুপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহা চমৎকার। ইহাপেক্ষাও অধিক চিত্ত-চমৎকার হইয়াছে, জয়দেব-বেশী শ্রীগোবিন্দের রূপবর্ণন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম চমৎকারের বিষয়—কবি-গৃহিণী পদ্মাবতীর সেই রূপ দর্শন এবং তাঁহার সেবা-আরাধনা। এই স্থলেই প্রীতিরসময় কাব্যযজ্ঞের পূর্ণাহুতি।

কাব্যরসের সমাশ্রয়ে ভগবদ্ভজন-প্রণালী প্রদর্শনই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান উদ্দেশ্য। জয়দেব-প্রণীত গীতগোবিন্দ গ্রন্থে সেই উদ্দেশ্য তিনি তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও শ্রীপাদ জয়দেবের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লীলাতেও তিনি স্বয়ং জয়দেবের কাব্যে শ্রীশ্রীরাধা-

গোবিন্দের সুমধুর লীলা-রহস্য নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরের নিভৃত কক্ষে বসিয়া সমাস্বাদন করিতেন।

এইরূপ ভজন-প্রণালীতে যে স্বয়ং ভগবানের সুধামধুর সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় শ্রীরূপের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন ঘটে, তাহা বাণী-বিজয় কাব্যের রচয়িত্রী শ্রীমতী জীবনবালা দেবী অতি পরিস্ফুট-রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সতীকুলশিরোমণি, একান্ত পতিব্রতা দেবী পদ্মাবতী পতির আকারে (প্রেমরসের পূর্ণতম প্রভাবে) যে প্রকারে নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের সাক্ষাৎ-সন্দর্শন এবং পরম প্রীতিময়ী সেবা সাক্ষাৎভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, উহার পরিস্ফুট চিত্রাঙ্কনই এই বাণী-বিজয় কাব্যের উচ্চতম বিশিষ্টতা। ইহাতে আমার বিবেচনায় রচয়িত্রী নিজেও ধন্য হইয়াছেন এবং ইহার পাঠক-পাঠিকাগণও ইহা পাঠে ধন্য হইবেন—ইহাই আমার বিশ্বাস। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীবৃন্দাবন
তাং ১লা মাঘ
১৩৪২

শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা বিদ্যাভূষণ

বাণী-বন্দনা

জ্যোৎস্নাজড়িত তুষার-কান্তি ঝলমলে লীলাহিল্লোলে,
শ্রীচরণ চুমি ভাব-সুধা-নদী উছলিত কলকল্লোলে।
কর-পল্লবে বেদ বেদান্ত, অঙ্কে শায়িতা 'কচ্ছপী',
ইন্দু-বদনে মন্দহাস্য, কর্ণে কুন্দগুচ্ছটি।
শ্বেত-অম্বুজ-আসীনা, শুভ্র হীরক খচিত অঞ্চলে—
পূর্ণকলায় কোটি কলানিধি হেন ঝিকিমিকি চঞ্চলে।
গুঞ্জরি আসে ভ্রমর ভ্রমরী, বনভূমি উঠে মুঞ্জরি,
জড় এ 'জীবনে' জাগি বসন্ত ফুটাইল 'প্রেমমঞ্জরী'।
বিশ্বভারতি, করি মা আরতি, জয়তি হে জগবন্দিতে,
'গীতগোবিন্দ-'নন্দনবন-গন্ধ-অনিল-নন্দিতে !

শ্রীপঞ্চমী
সন ১৩৪৪
শ্রীবৃন্দাবন

দীনাতিদীনা
পূজারিণী

শ্রীশ্রীগীত-গোবিন্দ-প্রশস্তি

কোমল কান্ত এই পদাবলী—"গীতগোবিন্দ" গাথা
থাক চিরকাল হয়ে মণি-মাল প্রেমিকের গলে গাঁথা।
অরসিক, যার নাই অধিকার, পরশিলে এই মালা,
মণি ফণী হ'য়ে দংশি ঢালিবে কাম-কামনার জ্বালা!

বাণী-বিজয়; পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০

ব্রজদর্শন

সেই তরুতলে সহসা দৃশ্য দেখে বিস্মিত কবি—
রাধা-সরোজিনীসহ বিরাজিত শ্রীরাধারমণ-রবি!

বাণী-বিজয়; পৃষ্ঠা ১৬৮

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বাণী-বিজয়

কবির সাধনা

বৈষ্ণব-কবি জয়দেব বসি' বাণীর কুঞ্জবনে,
শ্রীগীত-গোবিন্দ রচনা করেন তন্ময় প্রাণমনে।
আহার-নিদ্রা-সংজ্ঞারহিত—ধ্যাননিমগ্ন কবি,
ভাষার তুলিতে ফুটিছে তাঁহার কি মোহন প্রেম-ছবি!

আখরে আখরে রসের উৎস উছলি লেখনী-মুখে
ছড়ায়ে পড়িছে বিশ্বনিবাসী ভক্ত-প্রেমিক-বুকে।
অজয়ের তীরে পর্ণকুটীরে করে বাণী-আরাধনা,
ভাবে ও ভাষায় জাগে সে গাথায় ব্রজের উদ্দীপনা।

কবির-ভাববৈচিত্র্য

অর্থশূন্য তাঁহার দৃষ্টি কখনো গগন পানে,
কখনো পত্র—লেখনী উপরে, কভু নিমীলিত ধ্যানে;
কখনো স্ফুরিত হাস্য অধরে—কুঞ্চিত আঁখি-পাশ,
কখনো অশ্রু-বরিষার ধারে সিক্ত বক্ষ-বাস;

পুলক-প্রকাশে কম্পিত কভু, কখনো স্থাণুর প্রায়,—
ভাব-সমুদ্রে শত তরঙ্গ যেন গো খেলিয়া যায়!
বরজের লীলারসের সিন্ধু উথলি উছলি প্রাণে
কোন্ সুদূরের সঙ্গীত-সুধা ঢালিছে কবির কানে!

'কেন্দুবিল্ব' গ্রামেতে বসিয়া আছে দেহখানি তাঁ'র,
মন গেছে চলে' বৃন্দারণ্যে পাইতে জীবনাধার।
যাহা দেখে হেথা, ভাবে সেই কথা—ব্রজের মধুর লীলা,
এখানে সেখানে মিশাইয়া কবি খেলে অনুপম খেলা!

যদি দেখে কিছু ভাবে তা'র পিছু ব্রজভাব দিয়া তা'য়,
করি' অপরূপ দেখে হ'য়ে চুপ্ ব্রজাঙ্গনার প্রায়!
'অজয়ে' দেখিয়া যমুনার ছবি উদ্দীপনায় আসে,
হেরি' ঘন বন—যেন ব্রজ-বন তাঁ'র আঁখি-পথে ভাসে॥

পল্লীর নারী যায় সারিসারি কলস কক্ষে করে',
ব্রজ-বধূ যায় বুঝি যমুনায়—ভাবে কবি ধ্যান ধরে'!
পুষ্পের বাস আসে বারমাস ব্রজের বারতা লয়ে,
সুধীর সমীর 'ধীর-সমীরের' কথা কানে যায় ক'য়ে।

চাঁদের ছটায় দেখে কবিরায় ব্রজের বিপুল শোভা,
লয় মন হরি' কুঞ্জ-মাধুরী সুচির-চিত্তলোভা।
প্রেম-নীরে ভাসি' রাখালের বাঁশি শুনি কবি একমনে,
ভাব-সমাধিতে হয় সমাহিত ভাবি' যশোদার ধনে।

লীলায় প্রবেশ

দেখে একদিন, অম্বর মাঝে নবীন নীরদঘটা
ছাইয়া আসিল গাঢ় নীলিমায় বিকাশি বিপুল ছটা।
স্মরণ হইল কবির তখন—শ্যামল তমাল-বন ;
দেহ-ছাড়া হ'য়ে মন চলে ধেয়ে তখনি বৃন্দাবন।

তথা গিয়া কবি দেখে একি ছবি ! যেন শাওণের মাস,
বরিষে প্রবল বরষার জল মনেতে জাগায় ত্রাস।
গুরু গুরু গুরু গর্জ্জে বারিদ—দুরু দুরু কাঁপে প্রাণ।
ঘন কালিমায় নাহি দেখা যায় পথঘাট কোনখান্।

ঘন তরুশ্রেণী নিবিড় করিয়া লতা-জাল দেছে ঢেকে',
তার তলে বীথি সর্পাকৃতি ভূতলে গিয়েছে বেঁকে।
ডাকিছে দাদুরী আতুরী হইয়া ভাবী বরষায় ভেবে'—
যেন সামগান করি' আহ্বানে তাপসী ইষ্টদেবে।

দেখি' আসন্ন তমাচ্ছন্ন জলভরা কালো মেঘে
ল'য়ে ঝটিকায় প্রতিযোগিতায় পবন বহিছে বেগে।

বালক কৃষ্ণ ভয়াতুর আজ নন্দরাজের কোলে—
যায় বন-পথে, করি মনোরথে, বাণী লেখনীতে দোলে

বাণীর আগমন

"মেঘৈর্মেদুরমম্বর" বলি, বাণী এলো কবি পাশে—
লেখনী-হংসপৃষ্ঠবাহিনী—শ্বেত শতদল আশে।
দেখে বিকশিত—পত্র মাঝারে শুভ্র শতেক দল
পুঁথির আকারে কবির অগ্রে ফুটিয়াছে নিরমল।

অশ্রু-সলিল বহে অবিরল—যেন গো বরষাধারা,
সেই জলাশয়, তাহে ফুটি' রয় শ্রীকর কমল পারা।
মরাল-পৃষ্ঠে দিয়া শ্রীচরণ বসি' কমলের বুকে
হাসিল ভারতী মধুর হাস্য ভকত-সঙ্গ-সুখে।

কবির নেত্র-নীরে অবগাহি স্নিগ্ধ হইল দেহ,
ঘুচিল পথের শ্রম যাহা কিছু পাইয়া অপার স্নেহ।
স্নিগ্ধ নয়নে চাহি' মুখপানে তুলি' লয় বীণাখানি,
চরণে বাজিল মণি-মঞ্জীর নিজেরে ধন্য মানি'।

গুঞ্জরি' আসে মহাউল্লাসে সুর সারদায় ঘিরি'—
'মালব', 'গৌড়', 'দেশ', 'কর্ণাট', 'গুর্জ্জরী', 'রামকিরী'
শুভ্রবসনা—শ্বেত শতদলে শুভ্র বীণাটি কোলে—
অনুরাগ-বায়ু-হিল্লোলে যেন মৃদু মৃদু মৃদু দোলে।

সুরের আলাপ

করে আলাপিনী সুরের আলাপ সুছাঁদ ছন্দে ভরা,
সারদার করে হ'ল ঝঙ্কৃত সুরদা সপ্তস্বরা।
বাঁধে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, নি-ধা-পা 'মেঘমল্লারে' তান,
"মেঘৈর্মেদুরমম্বর" বলি' ধরিল বরষা-গান।

কাঁপিল বিশ্ব সুরতরঙ্গে,—প্রাণে আনে শিহরণ;
উলসিত দেহ, ছাড়ে সব গেহ কৃষ্ণ-ভক্তগণ।
কমল উপরে ভৃঙ্গের প্রায় আকুল হইয়া বসে
কৃষ্ণবর্ণ অক্ষর সব মঞ্জু মসীর বশে!

দেব, কিন্নর, আসে চরাচর—অহি, মহী-মৃগগণ
যখনি পশিল শ্রবণে তা'দের সুরের গুঞ্জরণ!
আজো সেই সুর বাজিছে মধুর বিধুর বঁধুর গানে,—
"দেহি উদারম্ পদপল্লব" ধ্বনি শুনা যায় কানে।
ছাড়ি' ঘরদ্বার সব হয় বা'র প্রেমের সাধক যা'রা—
যাহার কর্ণে পশিয়াছে কভু গীতগোবিন্দ-ধারা।
ভুলি' দেশকাল আজো সে দয়াল শুনে আসি এই গান,
এখনো স্বরূপে দেখা দেয় চুপে ভক্তের ভগবান্!

ভাব-রাজ্য

যাক্ সে কথায়,—কবি চলে' যায় মনোরথে করি' ভর,
বৃন্দারণ্যে প্রবেশিয়া দেখে মেঘের আড়ম্বর।

গোষ্ঠ হইতে কৃষ্ণে আনিতে গিয়াছিল ব্রজরাজ,
মেঘাচ্ছন্ন অম্বর দেখি' ভীষণ ভয়াল আজ!

ছাড়ি গোঠপাল লইয়া গোপাল আসে স্নেহাতুর রাজা,
কণ্ঠলগ্ন কৃষ্ণ তাঁহার—চরণে বেড়িয়া মাজা।
যেন নীলমণি মণিময় হারে ছুলিছে দোছুল্ ছুল্,
দেখি' জয়দেব মধু-স্নেহে ভাসি' হারাল' জীবন-কূল!

শ্যাম বনালয় মাঝারে আসিয়া দেখিল গোপের রাজ
—সঙ্গিনী সাথে যায় বনপথে রঙ্গিনী রাই আজ।
দেখি' এইরূপ কহে ব্রজভূপ, "শুন ও গোপের বালা!
ঘন গরজন মেঘের ভীষণ—চমকে বিজলী-জ্বালা!

আমি তাড়াতাড়ি যাইতেছি বাড়ী গাভীসব রাখি' মাঠে,
পাছে বরষায় কানু ভিজে' যায়—এই ভয়ে যাই বাটে।
অতএব রাই! লহগো কানাই, যাই আমি মাঠে চলে',
রাখিয়া শ্রীহরি গেল ত্বরা করি' রাজা এই কথা বলে'।

কুঞ্জ-বিলাস

হাসে মৃদু মৃদু সেই শ্যামবঁধু ধরিয়া রাধার কর,
গেল শিশু-রূপ, হ'ল অপরূপ-রূপময় কলেবর!
দেখি' সখীসব করে উৎসব করে করতালি দিয়া,
ঘুরায়ে ঘাঘরি রাধা-কৃষ্ণে ঘেরি' নাচে থেই থেই থিয়া

বলে, "এ বরষা অতীব সরসা,—শাওণে কাজরী-গানা
আজি হিঁদোলায় কেবা ভাল' গায় যাইবে তাহাই জানা
এস' রসরাজ! কুঞ্জবন মাঝ,"—বলি', কালিন্দী-কূলে
লতা-মণ্ডপে বাঁধা হিণ্ডোর—তাহাতে সবাই দুলে।

শিহরি' উঠিল স্ফুট কদম্ব নীপের শাখায় কাঁপি',
ফাটিয়া পড়িল রসে দাড়িম্ব অধরে দশন চাপি',
উজান বহিয়া যায় কালিন্দী ভুলিয়া আপন গতি,
সে ঝুলন-লীলা দেখি' গলে শিলা, মূরছে মদন রতি!

রাধা-মাধবের যুগল মূরতি—মধুর চাহনি হাসি—
দেখি' জয়দেব সুরাগ-পরশে বরষে অশ্রুরাশি!
উল্লাসভরে গুঞ্জরি' উঠে বাণীর বীণার তার,—
মধুপ-আখর উগলিয়া দিল' অমৃতরস-ধার।

বাসন্তী শ্রী

বাণী দিল সুর বীণায় মধুর চৈতী চৈত্রমাসে,
এলো বসন্ত হ'য়ে দুরন্ত, ল'য়ে অনঙ্গে পাশে।
অনুরাগভরে রাগ 'বসন্ত' 'বাহারে' লইয়া কোলে
বাণীর বীণায় ঘুরিয়া ফিরিয়া 'কড়ি' ও 'কোমলে' দোলে।

'গমকেতে' ধায় 'মীড়েতে' ঘুমায় 'ঝঙ্কারে' দেয় সাড়া,
মূরছিয়া পড়ে 'মূর্চ্ছনা' পে'য়ে হ'য়ে ঠিক্ সাথীছাড়া।

কভু 'উদারায়', কভু 'মুদারায়', কভু বা 'তারায়' গিয়া
সপ্তস্বরের সাথে 'বসন্ত' বেড়ায় 'বাহারে' নিয়া।

বাণীর চরণে মঞ্জীর বাজে লেখনী-হংসোপরি,
'যতি' তাল সাথে রহে সঙ্গতে অসঙ্গতিরে হরি'।
কর-কঙ্কণে আসি' ঘনে ঘনে 'রুণু রুণু ঝুণু' বুলি
সোমে পড়ে লুটে'—পদ-সম্পুটে, ছুটাছুটি সব ভুলি'।

বাজে রস-সুর মধুর মধুর—ব্রজসুন্দর-গানে ;
বাহ্য হারায়ে যায় কবিবর বৃন্দা-বিপিন পানে।
সুর-তরঙ্গে ভাসিয়া রঙ্গে এলো কবি ব্রজে আজ,—
মত্ত মদনে দেখিল তথায় সহ সখা ঋতুরাজ।

ললিতলবঙ্গলতাচুম্বিত কোমল মলয়-বায়,
মধুপনিকরে গুঞ্জিত বন—কোকিল কূজিছে তায়।
হইয়া আকুল বকুল ঝরিছে ভৃঙ্গের পদ-চাপে,
মলয়-সমীর-চুম্বনে লতা নবোঢ়ার মত কাঁপে।

উন্মদ-মতি মন্মথ রতি বিধুরা বধূরে দলে,
ঋতুরাজে হেরি' সকলেই লাজ ভাসায়ে দিয়াছে জলে !
এ চায় উহায়—শাখী ও লতায়, পশু-পাখী-নর-নাগে,—
সকলেরি মনে মিলন-বাসনা যেন নিশিদিন জাগে !

কুঞ্জ-ভবন উদ্ভাসি' হরি চন্দ্রা লইয়া সাথে
নৃত্য করেন সঙ্গিনীসহ মধুর চৈত্র-রাতে।

রাধা-কুবলয়ে মুদ্রিত আজ করেছে চন্দ্রাবলী,—
তাই ফুটি' ফুটি' হাসে বিপক্ষা সহেলী-কুমুদকলি !

পদ্মা এনেছে পদ্মলোচনে ছলে পথ হ'তে ধরি',—
দিয়া সখীপাশে করে উল্লাস নৃত্য-বিলাস করি'।
কবি হ'য়ে চুপ, দেখে রসভূপ বিলসিত রামাগণে ;
কিন্তু তথায় সে-রস না পায়, যে-রস শ্রীরাধা সনে !

শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী

'নীলিমা' * রাগাশ্রয়েতে থাকেন নায়িকা চন্দ্রাবলী,
আত্মগোপন-স্বভাব সে ভাবে,—দেয় মধু-রসে দলি'।
রূপে গুণে থাকে চাঁপার মতন বাহ্যে শোভনা হ'য়ে,—
হৃদি-মধু দানে কৃপণা, বাহিরে অনুকূল গতি ল'য়ে।

সব খোলা প্রাণ করে না সে দান—রাখে সম্ভ্রম কিছু ;
পাইলে কান্ত হইয়া শান্ত কুণ্ঠায় হয় নীচু।
দক্ষিণাভাবে কৃষ্ণেরে সেবে বাম্যতা-রস ত্যজি',
অনুকূলা নারী পে'য়ে তাই হরি যায় না তাহাতে মজি'।

বাধাহীন রস নহে সুসেব্য রসিকের কাছে কভু,
মধুচক্রেতে দংশন-ভয়,—লোভনীয় তাহা তবু !

* এই কাব্য-গ্রন্থের * চিহ্নিত শব্দগুলির অর্থাদি গ্রন্থের শেষে দ্রষ্টব্য।

ঝটিকার রূপ কত অপরূপ, পাকা মাঝি তাহা দেখে ;
'ধীর' তারে বলে, তুফানে ফেলিয়া তরণী-বাওয়া যে শেখে।
সেই বলবান—সেই গরীয়ান, তুফানে যে বাহে তরী,
সে নাবিকগণে চির-গরিষ্ঠ নায়ক-প্রধান হরি।

নায়িকার বাধা, বাধা নয়—বাঁধা, নায়কে রসের ডোরে।
যত করে মানা, তত যায় জানা—নিতেছে আপন করে'।
চোর-চূড়ামণি চিন্তামণির সদাই চিন্তা মনে—
কিরূপে হরিবে ব্রজ-যুবতীর যৌবন-মন-ধনে।

লুণ্ঠন-সুখ না পে'লে দস্যু হয় উন্মনা, যথা,—
দেখে কবিবর, সেই ভাবে আজ শ্রীহরি ভাবিত তথা।
কৃষ্ণচন্দ্র করেন যে কেলি চন্দ্রাবলীর সাথে,
সে যেন দাতা ও গ্রহীতার ভাব, নাই বীরত্ব তাতে।

'রক্তিমা' * রাগ-লক্ষণা রাধা—সতত হরির প্রিয়া,
'স্থায়ী'ভাবে * তাঁর করে না মলিন 'সঞ্চারী'ভাব * গিয়া।
স্থায়ীভাব তাঁর মঞ্জিষ্ঠার * অবিচল রাগসম,
অন্যাপেক্ষা রহিত, বাম্য-লালিমায় অনুপম।

এলে 'সঞ্চারী'ভাবের লহরী শ্রীরাধা-সাগর মাঝে,
ক্ষণেক তথায় খেলে' চলে' যায়, আসে না কোনই কাজে।
গূঢ়-গম্ভীর প্রেম-নীরে থির, আছে সে সিন্ধু ভরি'
আসে ভেসে' যাহা ফেলে দেয় তাহা, রাখে না যতন করি।

খুলি সারা প্রাণ দয়িতে সে দান করে সম্ভ্রম ত্যজি,—
কৃষ্ণ-ভ্রমর তাই সে কমল-মধুতে গিয়াছে মজি' !
পলকে পলকে নব নব স্বাদ পায় সে রসিক অলি—
তাই সু-তৃপ্ত হয় না চাঁপায়—ত্যজিয়া কমল-কলি।

আকাশের মত অসীম রাধিকা, উদার সিন্ধুসম ;
বালিকার মত সরলা, শিরীষ কুসুমের মত কম।
নারী-শিরোমণি সে প্যারী-মিলনে যে সুধা উথলি উঠে,
চন্দ্রাবলীতে তাহার আভাস কণিকামাত্র ফুটে।

কিন্তু রসের পুষ্টির লাগি বহুবল্লভ হরি
ভৃঙ্গের প্রায় নানা ফুলে ধায় মধুর লালসা করি।
চন্দ্রাবলীয় কুঞ্জে কৃষ্ণ করিছেন রস-কেলি,
আসি বহু রস প্রবেশে তথায়, বহু যায় খেলা ফেলি।

বিচিত্রতার থাকা হ'ল ভার আনুগত্যের ভয়ে,
বাম্যতা যায় দাক্ষিণ্যের নিঠুর পীড়ন স'য়ে,
নাই কোনোখানে প্রণয়-কলহ, নাই বাম্যতা-মধু,—
নাই সাধাসাধি, নাই কাঁদাকাঁদি দেখিয়া বিমনা বঁধু।

বক্র নয়ন-ভঙ্গীও নাই, নাই সে ব্যঙ্গবাণী ;
নাই দ্ব্যর্থক স্তুতি নিন্দায় নন্দিতা রসরাণী।
নাই সে হাস্য, বিলোল লাস্য প্রিয়ার অঙ্গভরি,
সন্তোষে দেখি' লালসার প্রাণ অকালে গিয়াছে মরি।

হেথা চুম্বনে নাই সেই স্বাদ—সুলভ বলিয়া অতি,
অবাধ আলিঙ্গনেতে আসে না সেই খরতরা রতি।
দেখি' রসাভাস বুঝি' আশপাশ ভ্রূ-বিলাস গেছে চলি,
এ লীলা-কমলে হয় না তাড়িত লুব্ধ কৃষ্ণ-অলি!

হেথা নাই সেই রসরাজ্যের মহিমান্বিতা রাণী,
বিশ্বের রসনিবেষিত যাঁর পূত পাদপীঠ্খানি।
হেথা নাই সেই মোহিনী মূর্ত্তি সুধাবণ্টনশীলা,
হয় না এখানে নিখিলবিশ্ববিমোহিনী সেই লীলা!

হেথা আছে শুধু অনুগতা বধূ, পতিরতা এক দেবী,
'সুরসিকা' পদবিহীনা কান্তা,—কান্তের পদ সেবি
হয়েছে ধন্য,—করে না ধন্য অন্যে টানিয়া পাশে—
যেহেতু কৃষ্ণ কদাচিৎ এই কুঞ্জ-কুটীরে আসে।

কৃষ্ণ-প্রেমিকা যতেক গোপিকা, থাকে রাধিকার পাশে;
যেহেতু ভৃঙ্গ ভ্রমেন সদাই শ্রীরাধা-মধুর আশে!
মূর্ত্তা দিবা ও নিশার মতন রাধিকা চন্দ্রাবলী,
ইঁহাদের মাঝে উত্তমা কেবা, কে দিবে কাহাকে বলি?

যুগপৎ হরি হ'য়ে ভানু শশী বাসেন এ দোঁহে ভালো!
তামসীর রূপ ভালো তাঁর কাছে কিম্বা দিবার আলো
জানে না মানব,—শুধু করে রব নীরব করিতে পরে;—
আপনার মত অন্যের মাথে অযথা আনিয়া ধরে!

বহুবিচিত্ররসসমাকুলা কর্ম্মবহুলা দিবা,—
আশা-আকাঙ্খা-সুখ-দুঃখের বর্ণে স্বর্ণনিভা।
শান্তা সে নিশি—তামসী তাপসী, আছে এক ধ্যান ধরি,
দেয় শ্রান্তের ক্লান্ত নয়নে বিরাম-নিদ্রা ভরি।

এ দু'য়ের মাঝে সুচির-সেব্য কে বলেছে কারে ভবে?
এই দুই বিনা এক সংযোগে কে সুখ চেয়েছে কবে?
এ ব্রজলীলায় দুই রসালয়ে রস-ভোগ করে অলি,
দিবসে সে করে রস-সঞ্চয়, নিশীথে ঘুমায় ঢলি।

রসভানু-সেবী জয়দেব-কবি আসিয়া বৃন্দাবনে—
দিবারে চাহিতে নিশারে পাইল, তাই থাকে আনমনে।
দেখে হেথা ম্লান সব নাচ গান, হাস্য লাস্য আদি,
সে মধুর রস যেন হেথা হ'তে অভিমানে গেছে কাঁদি।

কান্ত এখানে শান্ত মূরতি—কান্তারে ল'য়ে পাশে
অর্দ্ধ-ক্ষুধিত চিত্তেতে আজ নাচে, গায় আর হাসে।
সব আছে, শুধু নাই সোহাগিনী সে মহারাসেশ্বরী,
শ্যাম-চাঁদ হ'তে তাই সুধাধারা কে যেন নিয়েছে হরি!

দেখি এই ছবি চলি যায় কবি শ্রীরাধা-দরশ-আশে,
উৎসবহীন কুঞ্জ হেরিয়া কাঁপে গুরু গুরু ত্রাসে।

বিপ্রলব্ধা * রাধা

দেখে,— ম্লানমুখী যতসব সখী জ্বালিয়া বিরহ-বাতি
ব্যর্থ বাসর নাগর বিহনে—জাগিয়া কাটায় রাতি !
কৃষ্ণ-সেবার যত আয়োজন, গেছে সব বাসি হয়ে,—
কোকিল কোকিলা নিঝুম্ বসিয়া কি-যেন-কিসের ভয়ে !

ম্লানমুখী রাই, যেন প্রাণ নাই,—চিত্রার্পিতা প্রায়
দিয়া গালে হাত হ'য়ে হেঁট্‌মাথ্ ধরণী লিখিছে পায় !
রাধা-করাধীনা সে 'মহতী' বীণা পড়েছে ভূতলে খসি,
'রঙ্গিনী' মৃগী মৃগের সঙ্গ ভুলিয়া রয়েছে বসি।

মুখরা সারিকা নীরবেতে একা ভাবিছে কি-যেন কথা,
দুলিয়া আসিতে যেন করে মানা অনিলে ব্যথিতা লতা !
ফুলশেজখানি হ'য়ে অধন্য রয়েছে শূন্য বুকে,
তাম্বূল-বীটি ভূমিতে লুটায় না পেয়ে সে চাঁদমুখে।

ছিন্না মালিকা বালিকার মত কাঁদিয়া হইছে সারা ;
দীপাধারে ম্লান হয়েছে প্রদীপ না পেয়ে স্নেহের ধারা !
শ্রীরাধা কুঞ্জে এই অঘটন সুখ-বসন্তে আজ—
স্তম্ভিত কবি দেখি এই ছবি—যেন বাজে শিরে বাজ !

সখী-সংবাদ

(আলাপে)

দেখি বীণাপাণি লয় বীণাখানি করপল্লবে তুলে,
বাজেরে বারণ করিয়া সে বীণে 'খাম্বাজ' সুর বুলে।

প্রিয় সঙ্গিনী ‘ঝিঁঝিট্’ রাগিণী আসিয়া সখীর সনে
হৃদয়ের ব্যথা কহি যথাতথা ডাকে শ্যাম-নবঘনে।

রাধায় প্রবোধে সঙ্গিনী এক দেখায়ে কানন-শোভা—
“দেখ সহচরি, আজি বনালয় হয়েছে কি মনোলোভা!
ক্রূর মদনের কুটীল সঙ্গী দেখিয়া মোদের ক্লেশ
আরো শতগুণ বাড়াতে আগুন ধরেছে এমন বেশ।

কুসুমভূষিত সকল বৃক্ষ,—অলি গুঞ্জিছে তায়,
নবপল্লব তমালে বেড়িয়া বহে মৃগমদবায়।
কিংশুক ফুল মদনরাজের নখের আকার ধরি।
ফুটিয়াছে যেন নব্য জনের হৃদি-বিদারণ করি!”

পুন বলে সখী,—“দেখ শশিমুখি, মদনের আচরণ,—
যেন সাজিয়াছে বিরহীর সাথে করিবারে ঘোর রণ!
কুসুমধন্বা নব বসন্তে ধরিয়া বিজয়ী বেশ
নাগকেশরের কনক-ছত্রে ঢেকেছে কিরীট-দেশ।

অলিবেষ্টিত পাটলিকুসুম-বিলাসতূণীর ল’য়ে
বিরহী জনের জীবন নাশিতে আসিল কুঞ্জালয়ে।
হায়! ঋতুরাজ পরি’ ফুল-সাজ ধরি’ মলয়ার গন্ধে
ধায় ইতিউতি করিয়া যুকতি জ্বালাতে যুবতীদলে।

অলস হাওয়ায় প্রাণ থাকা দায়—অবশ করেছে সবে,
উদাসীর সুর শুনিয়া বিধুর কে বল ঘরেতে রবে!

কাননে আসিলে আরো প্রাণ জ্বলে দেখি বনানীর শোভা,
বিনা প্রিয় জন এসব দাহন হয় না চিত্তলোভা।"

সখী সংবাদ

(বিলাপে)

'সখি, জগতের রীতি বিপরীত,—আশ্রিতে দয়া নাই,
দেখ—বনালয় তা'র পরিচয় দিয়া দহে আজ তাই!
আশ্রয় দিয়া করিছে পীড়ন প্রতি রূপে, রসে, বাসে—
বিধুরা বালায় ব্যথা পায় হায়, বুঝে না এ মধুমাসে!

ঘরে নাই সুখ, বাহিরেও দুখ,—স্থলে জলে নাই ঠাঁই ;—
কৃষ্ণবিহীন জীবন লইয়া বল্ তবে কোথা যাই?
এই কথা বলি' উন্মনা আলি রহে গালে হাত দিয়া,—
পরখিয়া যায় অনলবন্ধু অনিল সবার হিয়া।

সরসিজাসনে বসি' একমনে দেখেন এ দশা বাণী ;—
শশিকিরীটিনী শর্ব্বরী কাঁদে নিজেরে বিফল জানি!
সমদুখিনীর এই কথা শুনি রাধিকার ঝরে আঁখি,
জয়দেব কাঁদে সেই বেদনায় মুখেতে বসন ঢাকি'!

অপরা রমণী মুছায়ে মু'খানি বলে,—'আদরিণী রাই,
ছাড় ওই কথা যাহে পাও ব্যথা, দেখ নিশা আর নাই!
কুলের ভরম, নারীর সরম হয়েছে মোদের নাশ—
দেখিয়া তরুণ বাতাবী প্রসূন হাসে যেন মৃদুহাস!

উচ্চদশনা কেতকী পুষ্প ভল্লঅস্ত্রপ্রায়
বিরহবিধুরা বধূরে নাশিতে বিকশিতা হ'ল হায় !
কুঞ্জের অলি করে নিঠুরালী—বনমালী যা'র নাম,
তারি শিক্ষায় শিক্ষিত এরা,—তাই আমাদের বাম !"

বলে আর সখী, "শুন বিধুমুখি, নাই তা'র কোন দোষ,
বিধাতাপ্রেরিত দূত বসন্ত, কেন কর বৃথা রোষ ?
আসে কালেকালে ছয় ঋতু মিলে' এ উহার আগে পিছে,
মোদের কপালে সব সুখ-কাল কৃষ্ণ বিহনে মিছে।

আজ ঋতুরাজ এই ব্রজমাঝ পাতিয়াছে যেন থানা,
এ-হেন সময় কৃষ্ণ-বিয়োগ—বিধির বিড়ম্বনা !"
বলে এক আলি, "ঠিক্ গো সহেলি, দেখ কি কঠোর কাল,
যেন অনঙ্গ ব্যাধসম হ'য়ে পেতেছে মায়ার জাল !

মোহবিমুগ্ধা আমরা পাপিনী অবোধ হরিণীপ্রায়
লঙ্ঘিয়া প্রেম-সাধনার সীমা পড়িয়াছি বাগুরায়।
আরাধনা যদি থাকিত মোদের তবে কি হইত হেন—
রাধিকা-কমল ছাড়িয়া মধুপ কেতকীতে যাবে কেন ?

শ্রীরাধার মোরা কিঙ্করী—নাই কান্তার অপরাধ,
কণ্টক-ভয়ে কমলবন্ধু ভুলেছে মধুর স্বাদ !"
আর এক নারী বলে,—সহচরি, আমরা পাপিনী বটে ;
কিন্তু যা' কিছু ধর্ম্ম তা' কিগো সব(ই) পদ্মার ঘটে ?

পথ হ'তে চুরি করে পরধন,—আরাধনা তা'র নাম !
তবে তো চৌর-দস্যুসকলে পাইবে মোক্ষধাম !
কা'র ধন কা'রে দিয়েছে পদ্মা, ভেবে দেখ বিধুমুখি,—
পাইল সে আজ কৃষ্ণ-সঙ্গ, আমরা হলাম দুখী !"

"বিধির বিচার নাই কোনোকালে"—বলে এক গোপবালা,
"দুষ্টে প্রসাদ করে সে সদাই, শিষ্টেরে দেয় জ্বালা।
ভক্তের কাছে শক্ত সে জন, কোমল দস্যুপাশে :
শত বিপত্তি শিষ্টেরে দেয়, কাঁপে দুষ্টের ত্রাসে !

রাধিকা সরলা—দিল তাই জ্বালা, কুটিলা চন্দ্রা সুখী,
চন্দ্রিকা লভি' কৃষ্ণচন্দ্র ভুলেছে চন্দ্রমুখী !"
আর এক ধনী হাস্যবদনী, বলে,—"ওগো প্রাণসই,
মানুষ-চুরির কথা কোনোখানে লিখেছে কি কোনো বই ?

ঘটিবাটি চুরি হয় তাহা জানি—জঙ্গম যাহা নয়,
সোনা, দানা, রূপা, অশন-বসন—এসব চৌরে লয়।
জঙ্গম মাঝে পশু-পাখীসব চুরি হয় তাহা মানি,
মানবী করিল মানবে হরণ,—একথা কভু না জানি !"

বলে আর নারী,—"ওগো সহচরি, শুন নাই তাহা বটে—
কিন্তু দেখেছ এই ব্রজভূমে হেন তস্কর-নটে !
যাহার অন্ত, মধ্য ও আদি বুঝিতে না পারে কেহ,
ছলে-বলে-কলে হরি' লয় সব প্রাণ, মন আর দেহ !

সেই বাসুদেব নন্দ-ভবনে নিজেই নিজেরে হরি'
আসিয়াছে, হেন শুনেছি প্রবাদ, ছল শিশুরূপ ধরি'!
অদ্য অবধি তাহার চৌর্য্য-লীলার নাহিকো শেষ—
যাহা পলে পলে আমরা সকলে অনুভব করি বেশ!

এবে, ব্রজবধূ—তার মনোমধু-মধুপ হইয়া হরি
বুলে ফুলে ফুলে—ফুট ও মুকুলে, 'গুণ গুণ' রব করি!"
এবে বলে রাধা, শ্যাম-সুরে বাঁধা যাঁর মনোবীণাখানি—
মানে অভিমানে বাজে একতানে যাহে শ্যামময়ী বাণী;

প্রলাপে-বিলাপে-আলাপে সে সুর ডুবায় ভাসায় যাঁরে—
সেই শ্যামা আজ ডুবে' যায় যেন শ্যামঅনাদর-ভারে!
"অপহৃতচিত্তা সত্য আমরা"—কহে ব্যথাহতা রাই,
"কিন্তু সে হরি ভিন্ন মোদের অন্য কেহই নাই!

হরিলেও মরি, না হরিলে স্মরি তাঁরই কথা রাতদিন—
কপালের ভোগ, একি মহারোগ করিল জীবন ক্ষীণ!
আজি বসন্তে আসি' বনান্তে খুঁজি মোরা চিত-চোরে—"
বলে এক নারী,—"কিন্তু চৌরে চন্দ্রা বেঁধেছে ডোরে!

সাবাস্, পদ্মা—চন্দ্রার চেড়ী, বেড়ী বাঁধিয়াছে পায়!
চৌরের রাজা পাইতেছে সাজা আজ তারই ছলনায়!
এই মধুমাসে কেতকীর পাশে গেছে হারাইতে আঁখি
ছাড়ি রাধা-মধু অরসিক বঁধু, আর কি অধিক বাকী!

মাধবীলতার কুসুম-গন্ধে, নব মল্লিকা-বাসে
মুনির মানস মত্ত হতেছে রসিকা-সঙ্গ-আশে।
কিন্তু মাধব, মাধবী ত্যজিয়া ফুটান কুন্দকলি—
ইহা হ'তে দুর্ভাগ্যের কথা বল্ সখি কিবা বলি!

আমাদের বাসি হয়েছে বাসর—তাহে নাই তত হানি,
অরসিকাসহ মিলনে বঁধুর না জানি কতই গ্লানি!"
বলে আর রামা,—"শুন মনোরমা, ছাড় সে শঠের কথা,
আমরা অবলা সহি সুধু জ্বালা, ব্যথা আর ব্যাকুলতা।

যা'রে মোরা তুষি, তাহারেই তুষি—অবশ প্রকৃতি হেন
নতুবা ভবন ত্যজিয়া কাননে যামিনী যাপিব কেন?
কা'রে দিব দোষ? নিজের চরণে দিয়াছি কুঠার সবে—
আমরণ এই বিষম বেদনা বক্ষে বহিতে হবে!

অবলা পাইয়া বধিছে সকলে, সবলে সবাই ডরে,
পঙ্কমগ্না করিণী হেরিয়া ভেকেতে প্রহার করে—"
হেনকালে 'কুহু' ডাকে মুহুমুহু কোকিল রসালশিরে—
বলি "উহু উহু" সঙ্গিনীসব কর্ণ রোধিল চীরে!

দেখি' এ রঙ্গ, প্রেমতরঙ্গে ভাসায়ে অঙ্গখানি
কভু হাসে, কভু কাঁদে জয়দেব,—স্তম্ভিতা তাহে বাণী!
জাগাইতে সাড়া, দেয় পাখাঝাড়া মরাল মানসজলে—
যেন খায় সুখে পত্রের বুকে অশ্রু-মুক্তাদলে!

শ্রীচরণ ছাড়ি' জাগায় চেতনা,—বাণী জাগরিতা হ'য়ে
'তিলক-কামোদী' বাজায় অলসে শিথিল বীণাটি ল'য়ে।
অনুভবে হেথা বিরহের ব্যথা কবি নিকুঞ্জে থাকি' ;
মিলি' সখীসব করে হাহা রব, এ উহার মুখ তাকি' !

যেন শরাহতা পিকের স্বরেতে, বেদনা বুঝাতে নারে—
বক্ষের ব্যথা চাপে যেন তাই দুই করে বারেবারে !
দুর্ব্বলা দেখি' মদন পাতকী দিল মলয়ের হাওয়া,
তাহে শতগুণ বাড়ায় আগুন জ্বালা যাতনায় ছাওয়া।

স্ফুট মল্লিকা, চামেলী, যূথিকা সমীরণে করে মানা,
কিন্তু সে শঠ করে বাস চুরি ফুলে ফুলে দিয়ে হানা।
লুটিয়া সে বাস ফেলে যেই শ্বাস, তাহে শ্বাসরোধ করে,—
ব্রজের নাগরী যতেক আহিরী লুটায় ধরার পরে !

স্বভাবে মৃদুল মলয়া, কিন্তু নাহিকো দয়ার লেশ,
আজি অনাহূত পশি নিকুঞ্জে জীবন করিছে শেষ !
গোপের যতেক দুলালী-মরালী, যেন মানসের জলে,
পুষ্পধনুর বিশিখ-আঘাতে আহতা হইয়া ঢলে !

মানস ঘেরিয়া বিরহ-বহ্নি জ্বলে দাবাগ্নি হ'য়ে,
দঁখিণা বাড়ায় দ্বিগুণ আগুন অদখিণ হিয়া ল'য়ে
দহে গোপবালা সহি' এই জ্বালা,—কেবল জীবন রাখে,
যেহেতু শমন কৃষ্ণের ভয়ে গোপিকায় নাহি ডাকে।

কৃষ্ণ-স্মরণে মৃত্যু শিহরে, কিন্তু না ডরে ব্যথা—
বাড়ে শতগুণ বিরহ-আগুন স্মরিলে তাঁহার কথা !
মরণ হইতে বেদনা যে বড়,—এ কথা কেহ না বোঝে,
তাই পায় পায় আসি' ঋতুরায় ব্যথাহতাগণে খোঁজে !

সখী-সংবাদ

(প্রলাপে)

ব্রজ কামিনীর নয়নের নীর দেখিয়া পাষাণ গলে,
শুধু অনঙ্গ দেখি' সে অশ্রু রঙ্গে নাচিয়া চলে !
তাই পে'য়ে বল, মদবিহ্বল সখায় লইয়া সাথে,
মথি' ফুলবন করিছে ভ্রমণ এ চারু চাঁদিনী রাতে।

কুসুমে কুসুমে দিয়া শিহরণ লতামণ্ডপ ঘেরি'
উড়ায় সমীর গোপিনীর চীর,—না করি' তথায় দেরী,
ছুটে' ছুটে' আসে কেতকীর পাশে উল্লাসে মাতোয়ারা—
লুটিয়া পরাগ উড়াইয়া চলে ফাগুয়ার ফাগ্‌পারা।

সুধীর সমীর করিল অধীর সহসখী রাধিকায়,—
তাই কেহ করে দোষারোপ তারে, কেহ করে, হায় হায় !
বিকারে প্রলাপ করে যে আলাপ, নাই তার কোন ক্রম ;
করে জীবন্তে জড়ে পরিণত—জড়ে চেতনার ভ্রম !

বিরহবিধুরা অধীরা নায়িকা প্রলাপে পবন-সনে—
শুনি সেই কথা কবি পায় ব্যথা মানস-বৃন্দাবনে।

"সবল বলিয়া অবলায় বধে"—কহে এক গোপবালা,
"সুখীর নিকট শীতল পরশ, অসুখীরে দেয় জ্বালা !

কে বলে মৃদুল, পবন তোমায় ? কাল হ'তে ক্রূর তুমি !
অরাজক পে'য়ে কর অবিচার শাসিয়া কানন-ভূমি !"
বলে এক বালা, "শুন গো সরলা, কুস্থানে ওর বাস—
যেথা, বিষধর চন্দন-শাখে ঢালে সুধু বিষরাশ।

সেই বিষে ভরা ওর নিশ্বাস, তাই বিষাক্ত জানি ;
বড় জ্বালাময়—সুখ হরি' লয়, করেনা জীবন-হানি।
বিরহ-বিকারে 'সূচিকাভরণ' মলয়গিরির হাওয়া—
বারিয়া মরণ আনে গো জ্বরণ সুধু যাতনায় ছাওয়া।

কৃষ্ণ-ভিষক্-প্রেরিত এ দূত আসে আমাদের কাছে—
বিরহ-জ্বরেতে গতপ্রাণা হ'য়ে যাই যমালয়ে পাছে !"
আর এক আলি বলে, "ও সহেলি, বাঁচাবার যার আশা,
সে কেন লবণ ঢালিবে এমন ক্ষতমুখে প্রাণনাশা ?

আমাদের হিত বাঞ্ছা করিয়া পাঠাইল যদি হরি,
তবে কেন বল হেথায় আসিয়া হবে ও এমন অরি ?
তাই মনে হয়, মোদের সুহৃদ নহে কভু সমীরণ ,
তারি সখা, যার কৃষ্ণ-মিলনে সুশীতল আজ মন !

চন্দ্রা-আলয়ে মধু-পার্ব্বণ—শুনি', উৎসব দিনে
এসেছে ভ্রান্ত হইয়া হেথায় পথঘাট নাহি চিনে !"

"পথ দাও ওরে, যাক্ সত্বরে" কহে এক ব্রজবালা—
"এখানে থাকিলে গ্লানি পলে পলে, উভয়ত হবে জ্বালা!

দক্ষিণা * গৃহে দক্ষিণা গেলে পাবে কত উপহার—"
"হইবে মিতালী" কহে এক আলি, দিয়া নানা উপচার!
বামা* রামা মোরা, দক্ষিণাসনে হবে না প্রীতির কথা,
সমজুটি হ'লে হবে গলেগলে, অসমে শুধুই ব্যথা!"

রাই বিধুমুখী বলে, "ওগো সখি, দোষ দাও ওরে মিছা;
নিঠুর শমনপ্রেরিত ভীষণ বঁধুর বিরহ-বিছা
দংশে শরীরে, তাই জ্বালা ধরে—ঢেলে দেয় প্রাণে বিষ,
নিঠুরা নিয়তিকৃত এই গতি—বৃথা ওরে দোষ দিস্!

কুস্থানে বাস, কুজন সঙ্গী মলয়ার তাহা জানি,
অহিবিষ মাখা ওর সারা গায়—একথাও খুব মানি;
কিন্তু জগৎজীবন বলিয়া পায় বহু মান ভবে,
আমরা বিধুবা বলিয়া কি ওর কর্ম্ম পড়িয়া রবে!"

আর এক নারী বলে, "সহচরি, সত্য তোমার কথা,
আমাদের মত ওও ব্যথাহত, সুখ নাই ওর কোথা!
যেথা করে বাস, সেথা বিষরাশ, দংশে ফণিনী আসি;
হেথা এলে চলে', আমরা সকলে গালি দিই রাশি রাশি!

তাই দেখ, যায় করি' হায় হায়, উত্তরদিকে চলে'—
তুহিনাবৃত হিমালয়ে গিয়া সিনান করিবে বলে'।

গিয়া কৈলাসে, সে পূত মানসে উল্লাসে অবগাহি',
পূজিয়া মহেশে, নিবে অবশেষে মনোনীত বর চাহি'।

হ'য়ে আশু তোষ সেই আশুতোষ, আশিস্ করিয়া ওরে
পাঠাবে ত্বরায় দখিণদিশায় আশীবিষ-ভয় হরে'।"
বলে এক বালা,—"ফিরিবার বেলা, এই বনপথ ধরি'
যেও হে সমীর, ব্রজদুখিনীর যাতনার কথা স্মরি'!

হে জগৎপ্রাণ! হ'য়ে কৃপাবান্ এস' এই পথ দিয়া—
সিনান অন্তে এই বনান্তে,—পরশি' মোদের হিয়া,—
দিয়া যেও সেই হিমবন্তের কিছু শীতলতা ঢালি';
পূজিব তখন তোমার চরণ দিয়া কুসুমের ডালি।

তুলিয়া বকুল, বুনিব দুকুল কলা-কৌশল করি',
দিব সে বসন তোমারে পবন, গত উপকার স্মরি'।
কস্তুরীসার দিব উপহার ভরিয়া পর্ণপুটে;
ফুলে ফুলে বুলি' কুঞ্জের অলি মধু আনি' দিবে পুটে।

করি' মধুপান হ'য়ে বলবান্ দাঁড়াবে ক্ষণেক আগে,
করিব রচনা দিয়া গোরোচনা তিলক ললাটভাগে;
বলয় করিয়া কুবলয়নালে পরাব যুগল করে,
গাঁথিয়া চিকণ যুথিকার হার দিব ও কণ্ঠোপরে;

আজানুলম্বী করিয়া দুলাব স্বর্ণমল্লি-মালা,
চরণে কনকচাঁপার নূপুর পরাইবে ব্রজবালা;

কটি-কিঙ্কিণী কেলিকদম্বে কর্ণে কেতকী-পাশা,
মঞ্জু গুঞ্জাফলে নাসা-মণি—নাসিকায় পাবে বাসা ;

গুচ্ছে গুচ্ছে গাঁথিয়া গুঞ্জা করি' নানা আভরণ,
পরাবে তোমার অঙ্গে অঙ্গে গোপ-অঙ্গনাগণ ;
আম্র-মুকুলে মুকুট রচিয়া দিব উষ্ণীষে বাঁধি' ;
'বিশ্ববন্ধু' বলিয়া ললাটে লিখি' নাম, যশ আদি

পাঠাবো তোমায় মলয়-অচলে, অহিগণে করি' মানা—
পুন নাহি খায় যেন গো তোমায়,—তা'র এই পরোয়ানা।
শ্রীরাধার রাঙ্গা চরণ-তাড়নে ফুটিবে অশোক-কলি,
পূরাইয়া সাধ সে মহাপ্রসাদ লইয়া যাইও চলি'।

অশোক করিবে অ-শোক তোমায় রাধা-পদ-পরশনে ;
বিশ্ব-ব্যাধির ঔষধি কিগো, ডরে সে সর্পগণে !
দুলায়ে দুকূল আর বনফুল, কাশের কুসুমে চড়ি',
যেও পথে চলে', কভু নদী-জলে—না দিয়া পারের কড়ি ;

শাখায় শাখায়, লতা ও পাতায় বুলায়ো কোমল কর ;
লীলায়িত করি' জল-তরঙ্গে তুলিও মধুর স্বর।"
"ত্বরিত গমনে শ্রান্ত হইবে"—কহে পুন গুণবতী,—
"ধীরে ধীরে যেও, হে ধীর সমীর,—যেয়োনা শীঘ্রগতি।

তরু-পল্লবে বসিও কখনো দুলায়ে চরণদুটি,
কখন' পেলব পুষ্প-শয়নে ক্ষণেক পড়িও লুটি ;

সরিষার খেত, বেণুবন, বেত—তোমার বিহার-ভূমি—
কভু বসি', কভু ভাসি' হিল্লোলে সবারে যাইও চুমি'।

তোমার পরশ লভি' বেণুবন হরষে বাজাবে বেণু,
শুনি' সেই গান, দিও তা'রে দান উড়ায়ে ব্রজের রেণু।
শ্বেত-নীল-পীত-লোহিত-জর্দ্দা-আসমানী ফুলগুলি,
সবুজ ক্ষেত্র রঞ্জিত করি' চে'য়ে র'বে গ্রীবা তুলি'—

চুমিয়া চুমিয়া যেও গো, সবারে সাদরে পরশ করি,,
ধরণীর গায় উঠিবে তাহায় তৃণ-রোমাঞ্চ ভরি'!
পরে যেও চলে' নভোমণ্ডলে খেচর পাখীর সনে ;
দেখি' অনন্তে শান্তি আসিবে তোমার ক্লান্ত মনে।

অভ্রের মত শুভ্র অমল মেঘের খণ্ডগুলি—
তরণীর প্রায় বাহিও তাহায় নিজপথে পাল তুলি'।
বলাহকদল করি' কোলাহল ভাসিবে আকাশ-গাঙ্গে,
তোমার ক্ষেপণী-আঘাতে তা'দের পক্ষ যেন না ভাঙ্গে!

এইরূপে, জল-স্থলপথ দিয়া আর ব্যোমপথ ধরি'
যেও চলে' তুমি মলয়-অচলে চির গৌরবে ভরি'—"
"দাঁড়াও অনিল, আর একতিল ; এখনি যেওনা চলে"—
ধরে সখী-কর আপন শ্রীকরে রাধা এই কথা বলে'।

পবনের প্রতি সখীর উক্তি শুনিতে শুনিতে রাধা
ভুলি' দেশ কাল পড়িল তখনি সেই সুর-জালে বাঁধা।

নিবিড় ভাবের প্রভাবে ভাবুক ভুলি' যবে আপনারে,
ধরি' নব রূপ ভাব্যে সাজায় নবীন রূপের ভারে—

তা'রে 'মহাভাব' কহে কবিগণ,—সেই ভাবময়ী রাধা—
যে ভাবে সে ডোবে, সেই ভাব লভে ছিঁড়িয়া জড়ীয় বাধা।
দিব্যোন্মাদ-লক্ষণ ইহা রস-শাস্ত্রেতে বলে,
শ্রীমতী রাধিকা বিনা এই রতি আসে না অন্য স্থলে।

মহাভাবময়ী রাধা

শ্রীমতী রাধায় হাসায় কাঁদায় হরিবিষয়িণী রতি,
কখন' সরল, সরস কোমল,—কখন' কুটিল গতি
ধরি' আসে কাছে, বুলে পাছে পাছে নানা ভঙ্গিমা ধরি'।
—সেই ভাবপ্রিয়া রাধায় হেরিয়া ভাসে প্রেম-নীরে হরি!

ভাবাবেশে রাই দেখে না কানাই, পাইলেও অতি কাছে;
শত বৎসর বিয়োগের মাঝে ভাবাবেশে শুধু বাঁচে!
কভু 'সখা' বলে' ধরে সে তমালে, আলাপে মেঘের সনে :—
এই গাঢ় ভাব-সম্পদে রাধা মুখ্যা গোপিকাগণে!

ভাবে গড়ে' রূপ, দেখে হ'য়ে চুপ, সেই রসভূপে রাধা,
অন্তরে থাকি' অন্তর্য্যামী তাই পড়ে' যান বাঁধা!
হেন সমর্থা * রতি-বন্ধনে কেহ বাঁধে নাই তাঁরে;
সমঞ্জসা * ও সাধারণী * রতি তাঁরে কি ভুলাতে পারে!

রাধা সমর্থা হন কৃতার্থা এই মহাপ্রেমযোগে,
রাধার বিরহে যেই সুধা বহে, নাই তা' অন্যা-ভোগে।
তাই ভগবান্, দ্বারকাপ্রয়াণ করি' কাঁদে 'রাধা' বলে'—
অষ্টোত্তর-ষোড়শহাজার ষোড়শী লইয়া কোলে!

কাঁদিয়াছে হরি, 'রাধা রাধা' করি, ক্ষুধিত মধুপ যেন;
কমলে যে রস পায় মধুকর, করবী তা' দিবে কেন?
রাধা-প্রেম-ধার বহে অনিবার তৈলধারার প্রায়,
হয় না কখনো ছিন্নভিন্ন কোনো প্রতিকূলতায়!

পাতিব্রত্যে নাই সে মাধুরী, নাই সখ্যে সে সুধা;
বাৎসল্যের মিলনে মিটে না সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা!
দাস্যেও দূর, শান্তে সুদূর—শুধু একাঙ্গ সেবা!
পারেনা হরিতে হরির চিত্ত কোনো দেবী, কোনো দেবা।

সব রসে মাখা—আরো কিছু ঢাকা, আছে হেন সুধাধারা—
যাহার প্রাপ্তি সম্ভব নহে খুঁজিলে জগৎসারা।
শ্রীরাধা-কমলে সুধু তাহা মিলে, তাই সে লোলুপ অলি
আসি বার বার পিয়ে রস-সার কমলের বুক দলি'!

বিচ্ছেদে রেখে' দেখে চেখে' চেখে' অশ্রুর কিবা স্বাদ,
জ্বালা দিয়া দেখে, সে পাকা সোনা আছে কিনা কোনো খাদ;
অন্তরে থাকি যায় সে পরখি' নিকষে কষিয়া নিতি—
তার কত টান, কতখানি প্রাণ, কত প্রেম—কত প্রীতি।

কত বিশ্বাস—দেখাইয়া ত্রাস, দেখে সে তীক্ষ্ণ চোখে ;
সবে গেছে হারি', শুধু সেই প্যারী হারেনি এ তিন লোকে !
ভাবে গড়া রাই—তার সবটাই ভাব ছাড়া কিছু নয় ;
ভাবের সিন্ধু কমে না বিন্দু—সদা সমভাবে রয় !

সিন্ধু মথিয়া সুরাসুর লভে অমৃত হলাহল'
এ ভাব-সিন্ধু-মন্থনে উঠে মহাপ্রেম অবিরল !
আজ সেই রাই না পেয়ে কানাই, ডুবি' গাঢ় ভাব-জলে,
জড়ে জড়াইয়া করিল অজড় মহাচেতনার বলে ।

তাই প্রলাপিয়া বলে সে পবনে—সখীরে সমীর ভাবি',—
"দাঁড়ারে অনিল, আর এক তিল ; কি হেতু এখনি যাবি ?
এখনো আসেনি উষা দিশাপানে, এখনো নেভেনি তারা,
এখনো চন্দ্র হয় নাই তার ক্ষীণ চন্দ্রিকা হারা ;

নিশার জোনাকি করে ঝিকিমিকি এখনো ঝোপের আড়ে,
এখনো তরণী খোলেনি পাটনী—বাঁধা আছে তাহা পাড়ে ,
ঝিল্লীর রব হয়নি নীরব—আছে দিগন্ত ভরি',
এখনো খায়নি তৃণ মৃগশিশু হরিৎ ক্ষেত্রে চরি' ;

জাগেনি দোয়েল, গাহিছে কোয়েল এখনো নিশার গীতি,
এখনো মিহির অস্ত-অচলে ছাড়েনি ছায়ার প্রীতি ;
মুদি' আঁখিপাতা, স্নেহাতুরা মাতা জড়ায়ে বাহুনি বুকে,
অমরাবতীর স্বপ্ন দেখিছে এখনো ঘুমায়ে সুখে ;

নিশা-জাগরণ করে নাই শেষ নব বর নব বধূ—
তুচ্ছ কথার আলাপে জাগিছে না জানি পে'য়ে কি মধু!
এখনো কুঞ্জে গুঞ্জরি' অলি আসেনি মধুর আশে,
কোক আর কোকী কাঁদে দোঁহে থাকি' নদীর উভয় পাশে ;

কামিনীকুসুম যায় নাই ঝরি', শিউলিও আছে বেঁচে',
ফোটেনি কঞ্জ বলি' খঞ্জনা এখনো আসেনি নেচে' ;
এখনো নিঝুম আছে গো, জগৎ প্রগাঢ় ঘুমের কোলে,
এখনো শঙ্খ বাজেনি দেউলে 'জয় জগদীশ' বলে' ;

মলয়-গিরির রম্য প্রাসাদে এখনো তোমার প্রিয়া
সুখের শয়নে দেখে সুস্বপনে উপাধানে শির দিয়া ;
তবে তাড়াতাড়ি যাইতেছ বাড়ী,—কিবা প্রয়োজন হেন ?
দাঁড়াও অনিল, আর এক তিল—এখনি যাইবে কেন ?

বঁধুর বিরহে অধীর আমরা, করেছি নিন্দা কত :
গোঁয়ারী আহিরী—জানিয়া রুষ্ট হয়োনা হে সুব্রত !
জ্বালায় জ্বলিয়া হয়েছি পাগল, হিতাহিত নাহি জানি ,
তাই অপমান করি সম্পদে, বিপদ মাথায় আনি !

তুমি মহাজন বিশ্বজীবন, শ্বাস-প্রশ্বাসে আসি',—
করি' জীবন্ত রেখেছ জগৎ—যমের যাতনা নাশি'।
অন্তরতর ! জান গো, খবর—লোকে যাহা নাহি জানে ;
অন্তরঙ্গ বলিয়া তোমায় তাই জীবগণ মানে !

হে অবাধগতি, আমাদের প্রতি কৃপা করি' যদি এলে ;
তবে এ তুফানে কাণ্ডারীবিহীন (এ) তরণী যেওনা ফেলে' !
ঘরবাড়ী ছাড়ি' অকূলেতে পাড়ি দিয়াছি আমরা সবে—
আশ্বাস দিয়ে আসিল না নেয়ে, ভাসায়ে ভবার্ণবে !

তুমি সব ঠাঁই যাও গো, সদাই—নাই কোনোখানে মানা ;
দৌত্য-কর্ম্মে দক্ষ বলিয়া পাইয়াছ পরোয়ানা !
আজ দয়া করে' নন্দের পুরে যাও তুমি ত্বরা করি',
গিয়া দেখ বুলি'—কোথা আছে ভুলি' প্রাণের বন্ধুহরি।

বলে সখীসব, করে উৎসব সখা কোনো নারীসনে—
তাই আসিল না—করে জল্পনা ইহারা সঙ্গোপনে !
সবে করি' কোপ করে দোষারোপ আমার প্রিয়ের প্রতি,—
শুনে পাই ব্যথা, ভাবি, বাতুলতা এদের হয়েছে মতি !

সে যে অতি সাধু, কামিনীর যাদু তারে কি ভুলাতে পারে !
আমাগত প্রাণ—পেয়েছি প্রমাণ কত শত শত বারে !
নিদয়া ননদী পদে পদে বাদী, লাঞ্ছনা করে কত—
সব অপমান করি' সমাধান করে যশ ধবলিত !

হইয়া কালিকা, মোরে উপাসিকা করিয়া দেখাল সবে ;
মুছি' কলঙ্ক করিল গো যাহা, তাহা কে দেখেছে কবে ?
কোটি কোটি বার মধু-ব্যবহার দেখি তার মোর প্রতি ;
তবে বলো, এবে তারে ক্রূর ভেবে' হ'ব কি ভ্রান্তমতি !

আমি জানি তা'রে, সে জানে আমারে, আর কেহ নাহি জানে ;
সমসূত্রেতে বাঁধা আছি মোরা ছুই দেহ এক প্রাণে !
বন্ধু এলোনা—মোর কল্পনা করে হেন অনুমান—
সখাগণে মিলি' কৌতুক-কেলি করি' সারা দিনমান,

হইয়া ক্লান্ত, সুনীল কান্ত তনু পালঙ্কে মেলি',
হইয়া সুপ্ত সুখের স্বপনে করে মোর সাথে কেলি।
স্বপনে জাগরে আমারেই স্মরে—এমনি স্বভাব তার ;
বৃথা দোষারোপ করে সখীগণ, কহি,—'ক্রুর ব্যবহার' !

ছুগ্ধফেনিল কোমল শয্যা পাতি' স্নেহাতুরা মাতা,
শোয়ায়ে বাছনি, জাগিছে যামিনী না ফেলি' আঁখির পাতা !
সুচাঁদ বদনে সুছাঁদ নয়ন-কমল রয়েছে মুদি',
মুখ-চাঁদে করে গৌরবদান গগনের চাঁদ উদি' !

বাতায়ন-পথে পশি' কোনোমতে হেরে সে শ্রীমুখখানি,
জাগাইতে মানা করে ইঙ্গিতে স্নেহবিহ্বলা রাণী।
তুমি ধীরে ধীরে পশি' সেই ঘরে পরশি' কোমল করে,
তন্দ্রা আনিয়া দিও বিনিদ্রা মাতার আঁখির 'পরে।

ঘুমালে জননী, বোলো এই বাণী বঁধুয়ার কানে কানে,—
'সারা নিশি বনে জাগে তব রাধা চাহি' তব পথপানে !
সঙ্কেত করি' কাননেতে প্রেরি', ভুলি' অভিসার-কথা,
সুখের শয়নে ঘুমালে কেমনে না বুঝি' পরের ব্যথা ?

জানিয়াও ভীরু, ভয়াল কাননে আনিয়া অবলা বালা,
ভুলিয়া ভবনে হইলে সুপ্ত কেমনে চিকণকালা ?
ঘরে গুরুজনা, কুলের ললনা যাপে নিশা আসি' বনে—
দিলে একি লাজ হে রসিকরাজ, আজ কুলবালাগণে !

দেখ—নিশি শেষ, উঠ হৃষীকেশ, আলস সাজেনা আর ;
গিয়া বনালয়ে শ্রীমুখ দেখায়ে রাখ প্রাণ রাধিকার।'
—এই কথা বলে', যেও তুমি চলে' সুখে বনপথ ধরি' ;
তব কথা শুনি', আসিবে এখনি আমার প্রাণের হরি।"

বলি' এই বাণী, রাধাসুবদনী ধরে অপরার করে,
বিধুরা ভ্রান্তা, সুদীনা কান্তা—হেরি' সব আঁখি ঝরে !
যেন পাগলিনী, বলে রাইধনী ধরিয়া সখীর গলে
স্রোতে বহমান তৃণে ধরি' যেন, মগ্ন সাঁতারি' চলে !

কহে "প্রাণসখি, দেখে' এসো দেখি, এসেছে কি মোর পিয়া ;
যেন বাস আসে—মধু-আশ্বাসে !—বিশ্বাসী মোর হিয়া
বলে কানেকানে—'বঁধু এইখানে',—আমিও তাহাই জানি ;
দেহছাড়া কভু প্রাণ কি গো, রয় ? সে যে প্রাণ, আমি প্রাণী।

নতুবা কেন বা রসালশীর্ষে মুকুল-মুকুট দেখে'
কলনাদ করে কোকিল কোকিলা—কলাপী উঠিল ডেকে' ?
বহে মৃদু বায়, কেন দেখা যায় বিভাসিতা বনভূমি ?
—গন্ধলোলুপ মধুপপুঞ্জ গুঞ্জে মালতী চুমি' ?

সে যদি না আসে, এ'সব কি হাসে ?—হয় কি সুষমাভরা ?
অতএব গিয়া কুঞ্জ-দুয়ারে দেখে' আয় তোরা ত্বরা।"
দেখে' এ দশায়, করে হায় হায়, সখীগণ ফেলি' শ্বাস ;
মূর্চ্ছা রাধার এ প্রলাপ-বাণী প্রাণেতে জাগায় ত্রাস !

দূতী-সংবাদ

করে কাণাকাণি যত সঙ্গিনী, প্রবোধ না পায় খুঁজি'—
হেনকালে আসে মৃদু শিঞ্জন—কৃষ্ণ আসিল বুঝি !
সবে মিলি' চাহে, কিন্তু তা' নহে—এসেছে বৃন্দাবতী ;
নীরবে একাকী হ'য়ে ম্লানমুখী অদূরে করিছে গতি !

বঁধুরে খুঁজিতে গিয়াছিল দূতী তৃতীয় প্রহর রাতে,
নিরাশ হইয়া এসেছে ফিরিয়া—শ্যাম নাই তাই সাথে !
ইঙ্গিতে তা'রে ডাকে এক বালা,—বৃন্দা আসিল কাছে ;
"পিউ কাঁহা ?" বলি' জিজ্ঞাসে তা'রে পাপিয়া বসিয়া গাছে।

সেই প্রশ্নেতে প্রশ্ন মিলায় যতেক বিধুরা বালা—
ভাবহারা প্রাণে চাহেন রাধিকা,—নয়ন প্রকাশে জ্বালা !
শতেক প্রাণের একই প্রশ্ন—"কই পিয় ? কই ? কই ?
রেখেছ কি তা'রে কুঞ্জ-দুয়ারে—কহ সুচতুরা সই ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বৃন্দা উদাস নয়নে চাহি',
কহে,—"সখি, কেন জিজ্ঞাস' আর, আর সে ভরসা নাহি !

পর হ'য়ে গেছে আমাদের প্রিয়, এখন নিয়েছে পরে
বন্দী হয়েছে রাধাবল্লভ আজি চন্দ্রার ঘরে।
খুঁজি' সারা ঠাঁই, না পে'য়ে কানাই আসিতেছিলাম ফিরে—
সহসা দেখিনু উজল আলোক ঝলকে কানন ঘিরে'।

ভাবি' দাবানল, হইয়া উতল ছুটিয়া গেলাম তথা,
গিয়া দেখি হায়, সব বিপরীত!—যা'রে খুঁজে' পাই ব্যথা,—
হেথা সেইজন ল'য়ে রামাগণ হতেছেন বিলসিত;—
কোটি চন্দ্রের ছটা সে অঙ্গে হইছে বিচ্ছুরিত!

নহে সে আগুন, কিন্তু দ্বিগুণ জ্বলিল আমার বুকে;
লুকায়ে অদূরে দেখিবার তরে দাঁড়ানু দারুণ দুখে!
সুন্দরবর সুনাগর শ্যাম—সুনীল নীরদ-কাঁতি—
চন্দ্রাবলীর সঙ্গে মিলিয়া জ্বেলেছে রূপের বাতি!

যেন তারাবলী, যতেক সহেলী থমকিয়া থাকি' পাশে,
করে ঝিক্‌মিক্, তাহে দশদিক্ উছলে রূপোচ্ছ্বাসে!
অনুপম নীল কান্ত হইয়া চন্দ্রকান্তমণি,
চন্দ্রিকা-লাভে বিগলিত হেরি' হাসে অনঙ্গ-অনী!

রসের আবেশে আঁখি ঢল ঢল, তরল চাহনি তাহে—
হইয়া তেরছ তরুণী-চিত্ত হরিছে মহোৎসাহে!

পীত কটিবাস করে উল্লাস লুটায়ে রাতুল পায়ে,
বন্দনা করে চন্দন-রাগ নন্দিত হ'য়ে গায়ে;

সুভালে তিলক দুলিছে অলক চৌদিক্ ঘেরি' তা'র—
বদন-চন্দ্রে রক্ষিতে যেন, সে-সব ফণীর সার !
সে মোহন হাসি, যেন সুধারাশি বাহি' পড়ে বিধু গলি',
নয়ন-কলসে ভরে তা' আবেশে সুভাগী চন্দ্রাবলী !
চারু বেণুধর রঙ্গ অধর—বিম্ববিড়ম্বিত,
করে কত নব রাগের সৃষ্টি—দ্রুত ও বিলম্বিত !
পরিরম্ভিতগোপিকাবল্লী বল্লব-বনমালী,
চলকুণ্ডলমণ্ডিত-চারু-গণ্ডযুগলশালী ।

নটনরঙ্গে রঙ্গিনীগণ নাচে, থেই থেই থিয়া—
মণি-মঞ্জীর-শিঞ্জনে উঠে কুঞ্জ গুঞ্জরিয়া ।
মূর্ত্তিমন্ত যেন নব রস পেতেছে তথায় থানা ;
ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী আলাপে গোপাঙ্গনা ।

সেই রসাবেশে মুগ্ধ মাধব—মত্ত সাগরপ্রায়,
উথলে যেন গো, রাকা-রজনীতে হেরিয়া চন্দ্রমায় !
রূপের প্রভায় নিষ্প্রভ যেন কোটি ভানু তারা শশী—
হেন রূপালোক দেখি নাই কভু যাবৎ ব্রজেতে বসি !

বাজে মন্দিরা, মুরজ, বংশী, তানপূরা সমতানে—
কিন্নরী করে মস্তক নত সুন্দরী-কলগানে !
'হা ধিক্, হা ধিক্ , ধিক্, ধিক্, ধিক্' বলে মৃদঙ্গ তাকে ;
হেন রসরাজ বিনা যেবা আজ দেহেতে জীবন রাখে !

তা-তা-থিয়া-থিয়া—নাচেন নাগর অতি অনুপম নাট,—
রসরাজ যেন চন্দ্রা-কুঞ্জে পেতেছে রসের হাট।
নব রসে সেবে রসিকশেখরে রসিকা চন্দ্রাবলী—
সে রসভঙ্গ-ভয়েতে ভামিনি, এলাম কিছু না বলি'।

নতুবা বৃন্দা আনিতে পারিত,—সে তো নাহি ডরে কারে ;
বিশেষত সেই চৌর কৃষ্ণে, আর যত গোপিকারে।—
শুন সখীগণ, ইহাই কারণ একা আসিবার মোর ;
অতএব ছাড়' সে শঠের আশা,—সে শুধুই মনোচোর।"

শুনিয়া শুনিয়া শ্যামের রঙ্গ গোপ-অঙ্গনা সনে ;
বিমূঢ়ার প্রায় বসিয়া তথায় থাকে রাধা আনমনে।

মন্ত্রণা

কহে এক বালা—"শুন গো সরলা বৃন্দাবন্দনীয়া,
পাইয়াও হাতে ছাড়িয়াছ চোর, শুনিয়া জ্বলিছে হিয়া।
রসভঙ্গের ভয়ে তুমি দেবি, করেছ ভীষণ পাপ.
যার ফলে হের রাধা-কমলিনী সহিছেন হেন তাপ।

কি ছার সে রস নয়টিমাত্র—যাহা চন্দ্রার কাছে ;
রসসমষ্টি-চতুঃষষ্টি শ্রীমতী রাধার আছে।
রাধা-মধু ত্যজি' গিয়াছে ভৃঙ্গ চিটাগুড় খুঁজিবারে ;
সে রসভঙ্গে পাপ হয়, ইহা লেখেনি শাস্ত্রকারে।"

বৃন্দা হাসিয়া বলে,—"প্রিয়সখি, সত্য সে-সব কথা ;
কিন্তু বৃন্দা সাধিকামাত্র—অধিকার তার কোথা !
শ্রীমতী সিদ্ধি, আমরা সাধিকা—কৃষ্ণের শুধু দাসী ;
তাই তাঁর রস-পূজার ভঙ্গে মনেতে শঙ্কা বাসি !

যতই ক্ষুদ্র হোক্ না বা কেন,—প্রভুর অগ্রে আসি',
করে যদি পূজা মূর্খ পূজক দিয়া কূপোদকরাশি,
প্রভু লন তুলে ;—ভৃত্য কি বলে' হইবে অন্তরায় ?
প্রভুর প্রভু যে, সে পূজা ভাঙ্গিলে নাই তাঁ'র কোনো দায় !

বিশ্বের প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র বলি' জ্ঞানীগণ মানে ;
কৃষ্ণের প্রভু রাধাআরাধ্যা—ইহা সকলেই জানে !
রস-রাজ্যের রাজ্ঞী কিশোরী, রস তাঁর সেবা করে ;
রসের সেবক যাহারা, তাদের রাণী কি কখনো ডরে ?

শ্রীমতী এখন করিলে গমন, অবাধে আনিবে ধরি ;
আনিয়া উচিত দণ্ড বিহিত কর গো, প্রাণেশ্বরি !
এখনো উষার অবকাশ আছে, চল' এই অবসরে—
কৃষ্ণে আনিয়া বহ্নুৎসব করি চন্দ্রার ঘরে !"

শ্রীরাধা-মাধুরী

শুনি' এই কথা, যত আশাহতা আশ্বাস পে'য়ে বলে—
"ধন্য বৃন্দা, নিভালে হৃদয়-বহ্নি শান্তি-জলে !

আজি অপমান করেছে চন্দ্রা শ্রীমতী রাধায় যত,
চক্রবৃদ্ধি করিয়া কুষীদ লও তা'র যথামত !
আর যেন হেন অনুচিত কাজ কখনো না হয় ভবে ;
অপরের পতি হরে যে যুবতি,—তার এই গতি হবে !

শ্রীমতী রাধার জীবন আধার কৃষ্ণচন্দ্রে হরি',
উচিত শাস্তি পাউক চন্দ্রা চিরদিন হা হা করি' !
বালিকার মত সরলা রাধিকা, নাই কুটিলতালেশ,
মাত্র কৃষ্ণবিরহ-অনলে জ্বলে তাঁর হৃদিদেশ !

কৃষ্ণ-সেবার গেছে অধিকার, সেহেতু ক্ষুণ্ণমতি ;
করে না কখনো অন্যায়রূপে অন্য জনার ক্ষতি !
সখীদের বাণী শুনি' তাই ধনী পড়েছে বিষম গোলে—
নিজ অধিকার, ক্ষতি অপরার—তুলিছে এ তুই দোলে !

আসি' আশঙ্কা টানে একদিকে, আশা আন দিকে টানে—
দোটানায় রাই হাসে আর কাঁদে চাহি' সখী-মুখপানে !
নিটোল কপোলে হাসি ঝলমলে চটুল নয়নে ফুটি'—
স্বচ্ছ সলিলে যেন সুখে বুলে চপল সফরী তুটী !

আয়ত নেত্র যাচে সখিত্ব শ্রবণের কাছে গিয়ে,
দেখিয়া ভ্রূলতা আঁখির ভীরুতা, যায় তা'রে সাথে নিয়ে !
অন্ধ সে শ্রুতি শুনিছে যে গীতি, আঁখিরে বুঝায় তাহা ;
মূক আঁখি তাহা বুঝেনা বলিয়া সুধায় সুগম রাহা।

নয়নে শ্রবণে মৈত্রী করাতে সখীরা যত্ন করে,—
কভু উচ্ছ্বাসে বাসনা প্রকাশে, কভু অনুযোগভরে।

নধর অধর কাঁপে থর থর কভু বা ভাবের বশে ;
কভু সে আস্য সরল হাস্যে, কভু কৌতুকরসে
হয় বিকশিত,—করি' অঙ্কিত ভুবনমোহন ছবি ;
প্রতিলিপি তা'র করিবে প্রচার, ভবে নাই হেন কবি !

গম্ভীরভাবে কভু বসি' ভাবে গভীর সিন্ধুসম ;
সংযমী যাঁরা, তাঁরাও মুগ্ধ দেখি' সে সুসংযম !
কভু লাজ আসি' দেয় সব নাশি ; তাই নতমুখী রাধা
সকল যুক্তি দেখি' অযুক্তি, পায় পায়পায় বাধা !

যত সঞ্চারী ভাবের লহরী বহু রূপ রস ধরি',
আসিয়া বিহরে শ্রীরাধা-সাগরে কল কল্লোল করি' !
যত সখীগণ করাকর্ষণ করে রাধিকায় ঘেরি'—
বলে বার বার, "সখি, কেন আর করিতেছ হেন দেরী !"

অচলা প্রতিমা হয় না সচলা ; শঙ্কিতপ্রাণা রাধা
আলো ও আঁধারে লঙ্ঘিতে নারে শ্যামের সে মর্য্যাদা !
এই অপরূপ রাধিকার রূপ দেখি' বিস্মিত কবি,—
করি' রেখাপাত কম্পিত হাত, তুলিতে পারে না ছবি !

শ্রীরাধা-বোধন

হ'য়ে কুতূহলী, সখীগণ মিলি' দেয় উৎসাহ বহু,—
হেনকালে পিক শাখীর উপরে বলে, 'রহু রহু রহু'।
বাণী দিল সুর বীণায় মধুর 'নটনারায়ণ' নামে,—
করিল ঘোষণা সংগ্রাম যেন, বুলিয়া তিনটি গ্রামে।

আধ' কৌতুক, আধ' যৌতুক-প্রতিশোধ ল'য়ে করে,
'নট' নেমে এল' গোপিকাচিত্ত-রঙ্গভূমির পরে!
নাচি' ধিয়া ধিয়া, আনিতে বঁধুয়া আহ্বান করে রণে;
মদন হইল সঙ্গী বিজয়-দুন্দুভি ল'য়ে সনে;

সকল রমণী হইয়া চারণী বীররস-গাথা গাহে,—
ভাবমূর্চ্ছিতা রাই-স্নেহলতা হয় জাগরিতা যাহে।
আশ্বাস-বারি সিঞ্চনে যবে যায় কিঞ্চিৎ জ্বালা,
হন প্রবুদ্ধা তখন শ্রীমতী বৃষভানুরাজবালা!

বৃন্দা কহিছে,—"এইরূপ বেশে হবে না সিদ্ধ কাজ;
হয়েছে যে ব্যাধি, তা'র ঔষধি দিতে হবে ঠিক্ আজ।
আজি রীতিমত করি' লাঞ্ছিত চন্দ্রাবলী সখীগণে,
চতুর গোপালে আনি' কৌশলে, বিজয়িনী হও রণে!

লম্পট শঠ ধূর্ত্ত কপট চোর-চূড়ামণি বলি',—
স্পর্দ্ধা তাহার হয়েছে বড়ই, দাও তাহা আজ দলি'!

দর্পহারীর দর্প নাশিয়া হও বিজয়িনী ভবে,—
"জয় রাধে" ক'বে জগৎ, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য র'বে!
ধর' পুরুষের বেশ ওগো, প্যারি, আমরাও হই নর;
গিয়া সেই বেশে ধরি' হৃষীকেশে, কর' পরকীয়া পর।

রাধিকায় শ্যাম সুখী নয় যদি, দাও গালে চূণ-কালি:
চন্দ্রার যাক্ সতীপনা আর পদ্মার চাতুরালী!
বৃন্দারে আজ লঙ্ঘিয়া যায় পদ্মা চাতুরী-গুণে;
—লবণে হইল মিষ্টতা হায়, চিনি পরিণত নুণে!

কালে কালে হবে আরো অঘটন,—এখনো কলির বাকী;
রসবতী হ'ল চন্দ্রা-নায়িকা, বিরসা রাধিকা নাকি!"
যত গোপবালা বলে—"গো, সরলা, যা বলিলে তাই ঠিক্;
পূরব হইল পশ্চিম, আর পশ্চিম প্রাচীদিক্!

যেথা ব্রজরাজ-সুত করে রাজ, সেথা কি সাধুতা খাটে;
কোটালী-বৃত্তি যাহার, তাহাকে বৃথা রাখা রাজ-পাটে।
রাই-রাজ্যেতে নাই অবিচার, মোরা শ্রীরাধার প্রজা;
তাই বলি, যদি বাঁচিবার সাধ, হোয়োনা কৃষ্ণ-ভজা।

হাসে মৃদু মৃদু চুয়াইয়া মধু, রাধিকা সে কথা শুনি',
ব্রজবালিকার গোপন বেদনা হিয়ার মাঝারে গুণি'।
বৃন্দারে ডাকি' বলে, "প্রাণসখি, নারী কি গো, হয় নর?
পুরুষ-সজ্জা আমাদের তাই নহে সম্ভবপর।

আর যদি কিছু থাকে সদুপায়, তাহাই এখন বলো,
যদি যেতে হয়, উষার অগ্রে সবে মিলে' যাই চলো।"
বৃন্দা হাসিয়া বলে "ওগো, রাধে, চিন না নিজেকে নিজে
যে দেয় স্বয়ং ব্রহ্মোরে রূপ প্রকৃতি আকারে পূজে',

তা'র কি গো হয় রূপের অভাব? এই তিন লোক মাঝে
যা কিছু প্রকাশ সৃষ্ট বস্তু,—তোমারি তো ছায়া রাজে।
স্বয়ং প্রকৃতি ইচ্ছাস্বরূপা, - ইচ্ছাময়ী যে নাম ;
ইচ্ছামাত্রে প্রলয় সৃষ্টি, স্থিত হয় তিন ধাম।

নিজের মায়ায় আজ বিমোহিতা ; কহ বিমূঢ়ার প্রায়
প্রবলা হইয়া ইচ্ছা প্রকাশ',—যাহে নারীভাব যায়।
আমিও বৃন্দা তব কিঙ্করী, নহি কেও-কেটা কেহ ;
পুরুষের বেশে সাজাই শীঘ্র হেন অনুমতি দেহ'।"

সস্মিতমুখী রাধা কহে, "সখি, তাহাই হউক তবে ;
কোন্ রূপ তুমি চাহিছ আমার, যাহাতে সুবিধা হবে?"
বৃন্দা কহিল, "বলরাম-রূপ, শোনো মনোরমা রাই,
যাঁহার ভয়েতে ত্রস্ত সদাই থাকেন অনুজ ভাই!

বিশ্বমাঝারে কাহারো ভয়েতে নহে বিচলিত কানু,
শুধু 'বলরাম' শুনিলে এ নাম, মেঘে ঢাকে যেন ভানু।
সেই হলায়ুধ অগ্রে প্রকাশ হইলে এসব চুরি,
চপল কান্ত হইবে শান্ত, চন্দ্রা মরিবে ঝুরি'।"

"সাবাস্ সাবাস্" কহে সখীসব, করে করতালি দিয়া,
প্রণমে সকলে দূতী-পদতলে গলেতে বস্ত্র নিয়া।
বলে, "ওগো, দেবী, সম্ভব সবি তোমার বুদ্ধিবলে ;
কি ছার পদ্মা, পদ্মযোনিও নতশির হ'য়ে চলে।

করিতে পার গো, বিশ্ববিজয় বিশ্বপতির সনে ;
বলাই-অস্ত্রে শত্রুনিপাত কর দেবী, এইক্ষণে।"
হাসে, হি হি হা হা, নাচে থিয়া থিয়া রঙ্গিনী ব্রজবালা,
কবি ধরি' সুখে এই ছবি বুকে দেখে দীপালির আলা।

রাই বলে, "ভাই, তাহে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটি কথা,—
জ্যেষ্ঠের প্রায় ডাকা কি গো, যায়, উহাতে যে পাই ব্যথা !
'হাঁরে রে রে ওরে গোপাল' বলিয়া কেমনে ডাকিব আমি,
সহজে সে পতি, 'তুই' বলি তা'রে হব' কি নিরয়গামী !"

বৃন্দা হাসিয়া বলে, "বিধুমুখি, তাহে নাহি কর' ভয়,
'তুই' এর প্রয়োগ আত্মীয় বিনা অন্যে নাহিক' হয় !
আর, নাম ধরে' ডাকিলে পতিরে, দুধভাত খায় জানি,
'হাঁরে ওরে' ওতো সখ্যমধুর, তবে বল' কিসে হানি ?

গোঁয়ার গোয়ালা 'তুই'তে তুষ্ট, পূজাটুজা নাহি বুঝে,
যতদিন তুমি উহা না করিবে, ততদিন মর খুঁজে !"
বৃন্দার এই চাতুরী শুনিয়া হাসে সখীসহ রাধা,
কৌতুকবশে সঙ্গিনীসব হ'ল পাগলিনী আধা !

রাধা মনে মনে ভাব-সম্বরণে হইল যত্নবতী,—
সুদৃঢ় ভাবের পূর্ণ বিকাশে প্রকাশে নরের গতি।
ভাবময়ী রাধা ভাবে পায় রূপ,—ভাবুক বিনা না জানে !
যে ফেরে ভাবের সন্ধানে সেই ভবভাবনের ধ্যানে,

সেই পায় কিছু আলোক তাহার, অন্যে দুরূহ অতি !
ভাবের মুকুরে বিশ্ব-প্রকাশ ; নতুবা কাচের গতি।
ভাব-বিপর্য্যয় দেখিয়া রাধার, জয়দেব বাক্‌হারা,—
সাধনরাজ্যে এই দর্শন দর্শনমাঝে সেরা।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাপ্রকাশ দেখিয়া বৃন্দাবতী।
সাজায় রাধায় হলায়ুধপ্রায় নিপুণ হস্তে অতি।

বৃন্দাদেবীর সেবা

এই ব্রজবনে তরু-লতাগণে লীলার সহায় সবে।
বৃন্দাদেবীর আদেশবর্ত্তী থাকিয়া নবোৎসবে
করে নব নব স্বভাবপ্রকাশ সে কল্পতরু-লতা,
যবে যেই ভাবে যেই খেলা হবে, সেই ভাব ধরি' তথা।

কাননের দেবী বৃন্দারে সেবি' নিবসে বৃন্দাবনে,
হেন অগণন আছে দেবীগণ ঋদ্ধি সিদ্ধি সনে।
বাসনামাত্রে দিবস রাত্রে করে পরিণত তা'রা,
করে অভিনব বিভব সৃষ্টি ধরিয়া লীলায় ধারা।

তাপসী-বৃন্দা-পরমানন্দা বরবন্দিতা হ'য়ে
বাঁধিয়া দিয়াছে সমস্ত্রেতে গোলোকে ভূলোকে ল'য়ে।
এই ব্রজভূমি আছে ধরা চুমি',— কিন্তু নহে এ ধরা।
যোগমায়াবলে পরিকরদলে ভাবে. এ বসুন্ধরা।

প্রাকৃতপ্রায় কৃষ্ণেরে চায় যতসব ব্রজবাসী,
ভাবের মাধুরী আস্বাদে হরি তাই ব্রজভূমে আসি'!
হৃদয়ে ধরিয়া হৃদয়-দেবতা, শ্রীরাধা ও সখীগণে,
সুখে যাপে দিন বৃন্দা বিপিন-লীলার আস্বাদনে!

আজি অভিনব বলরাম-লীলা জাগে বৃন্দার মনে,
বিপ্রলম্ভে পাইয়া সুযোগ তাই মিলে রাধা সনে!
মুগ্ধা রাধায় নিজ ভাবনায় ভাবিত করিয়া, পরে
বলরাম-বেশে সাজায় শীঘ্র শিল্পকুশল করে!

অনুচরীসবে আহ্বানে যবে, আসে সব কামচরী,
আনি' উপহার যোগ্য পূজার যোগায় যতন করি'।
ল'য়ে এল' উষা অভিনব ভূষা মণি-মঞ্জুষা ভরি',
কমলা আনিল কুবলয়-হার কমল-পত্রোপরি;

মৃগমদ মথি' আনি' দিল রতি তিলক-রচনা তরে,
গোরোচনাগুরু কর্পূর-চারু গৌরী আনিয়া ধরে;
নীল অম্বর আনে সত্বর শ্যামকুন্তলা নিশা,
আহরণ করি' পাত্রেতে ভরি' মধু আনে বধূ-দিশা;

স্নিগ্ধ সঘন আনে চন্দন সখী-গন্ধিনীবালা,
নান্দী আনিল নন্দ-কাননজাত কুসুমের মালা ;
হল ও মুষল আনে কুন্তলা, লকুটি ছাঁদন-ডোরী,
বিষাণ আনিয়া রাখেন ঈশানী পুষ্পমঞ্চোপরি ;

রসরঙ্গিনী যত সঙ্গিনী গাথে কুসুমের ভূষা,
তারাবলী সনে আসে স্থলগণে কর্ম্মকুশলা পুষা।
বনদেবীগণ ল'য়ে উপায়ন আদেশ পাইয়া ত্বরা।
যথাযথভাবে দিয়া সেই সবে সেবে হ'য়ে সেবাপরা।

বৃন্দা-নিদেশে নিশা নভোদেশে নিশ্চলা হ'য়ে রহে,—
দেবীর করুণা দেখি' কুমুদীর নয়নে অশ্রু বহে !
দীর্ঘ রজনী দেখি' নিশামণি ছড়ায় অংশুমালা,—
সে রূপালী রঙ্গে সব রঙ্গে' রঙ্গে' ভুবন করিল আলা।

সমর সজ্জা

ব্রজদেবীগণ করে প্রসাধন প্রিয়ায় যতন করি' ;
পড়ে তাহে কামকোটি-কমনীয় ললিত লাবণী ঝরি'।
রাধার বর্ণ—গলিত স্বর্ণ বিকাশে বিপুল শোভা,—
শ্বেত শ্রীখণ্ডে মণ্ডিত করি' ঢাকে সে স্বর্ণ-প্রভা !

পুষ্পের সার দিয়া কেশভার করিয়া স্নিগ্ধ শুচি,
বিন্যাস করে বৃন্দা স্বকরে সূক্ষ্ম বসনে মুছি' ;

দিয়া নানা ফুল চূড়াটি অতুল করি' শিখী-পাখা বাঁধে,
চন্দ্রক-চূড় দেখিয়া বিমূঢ় কাম-ভুজঙ্গ কাঁদে ;

চূর্ণ অলক ললাটফলকে ফণী-শিশুসম খেলে,
ময়ূরাকৃতি কুণ্ডল তাহা দেখে দুই আঁখি মেলে',—
বদনচন্দ্রসঞ্জাত স্বেদ-সুধায় স্নিগ্ধ তারা,
শিখী-কুণ্ডল সনে বিলসিত হয় হ'য়ে ভয়হারা।

চারু-নীল বাস পে'য়ে কটি-বাস খেলে বাতাসের সনে,—
কৈলাসে ঘেরি' উল্লাসে মেঘ,—আনে এ আভাস মনে!
চপল ক্ষুদ্র ঘন্টিকাশ্রেণী ক্ষীণ কটীতট ঘেরি'
জিনিয়া মদনে বাজায় জঘনে সঘনে বিজয়ভেরী।

কোমল অঙ্গে ললিত রঙ্গে বালচাপলাভরে
কাঞ্চী কেয়ূর কঙ্কণ আদি যেন গো, নৃত্য করে।
মণি-মঁরকতে জড়িতাঙ্গুরী বিথারে রূপের আলা,—
শ্রীকরকঞ্জে যেন গো, রঞ্জে মঞ্জুল অলিমালা।

মুক্তালহরী সে ত্রিবলীহার ত্রিবেণীধারার প্রায়
কুচ-গিরিচূড় বেড়ি' মিলিয়াছে ত্রিবলীর ত্রিধারায়।
শুভ্র অমল শ্রীমুখকমল, মাঝে কুবলয় দুটি
আঁখির ছলেকে বাঁকিয়া আলসে শ্রবণে পড়েছে লুটি'।

আঁখির দৃষ্টি কমল-বৃষ্টি, হাসি কমলের রাশি,—
ঝরে চিরদিন সুচির নবীন,—হয় না কখনো বাসি।

ছদ্মবেশেতে পদ্মের বাস শ্বাস হ'য়ে আসে চলি' ;
হৃদি-সরোবরে ফুটেছে সরোজ, পাছে জানে কোন' অলি।

বক্ষ উপরে আসি' অলক্ষ্যে কোমল কোরকদুটি
হ'য়ে অভিন্ন ঈষদ্ভিন্নভাবেতে উঠিছে ফুটি।
দিয়া উত্তরী কাননেশ্বরী বৃন্দা ঢাকিল তাহা,
সোনার কমল দেখিয়া পাগল হয় পাছে ব্রজনাহা।

কর্ণযুগলে কুট্‌মল দোলে কর্ণিকাগুলি মুদি',—
ফুটিবে তখন, কৃষ্ণ-তপন হাসিবে যখন উদি'।
সুভুজ-মৃণালে সোহাগেতে দোলে কর-কোকনদ দুটি,—
সে করাম্বুজ-মাধুরী হেরিয়া অম্বুজা এলো ছুটি'।

অধর-সুলাল, সুন্দর ভাল, গণ্ড. চিবুক, নাসা,—
সকলি পদ্ম দেখিয়া পদ্মা অঙ্গে বাঁধিল বাসা।
"পদ্মগন্ধা গান্ধর্ব্বিকা" তাইতো সকলে বলে ;
পদ্ম-নিলয় বলি, টানি' লয় যত পদ্মিনীদলে।

কেহ স্ফুট, কেহ অর্দ্ধস্ফুট, কেহ বা শুধুই কলি,—
শ্বেত-নীল-পীত-লোহিত বর্ণে গায়ে গায়ে আছে ঢা'ল'।
রক্তোৎপল-অঙ্ঘ্রিযুগল অঙ্গুলি-দল মেলি',
ভক্ত-ভৃঙ্গে লইয়া সঙ্গে করে সুরঙ্গে কেলি।

ধরায় ধন্য জগতে মান্য বাসনা-দৈন্যহারা
হয় গো, তাহারা, এ পদ কমল আরাধনা করে যারা।

শ্রীপাদপদ্মে নূপুর পরায় সাধিকা বৃন্দাবতী,
ভাবে, এ ধন্য, —আমার জন্য বিধি না দিল এ গতি।

শিরে স্নুপুচ্ছ, গুঞ্জাগুচ্ছ, ললাটে তিলক-শোভা,
মুক্তার মালা কণ্ঠে দুলায়ে করিল চিত্তলোভা।
পীন পয়োধর ঢাকিল পুষ্পমালায় সঘন করি',
জানুরে পরশি' দুলে মালা আসি' লুটাতে চরণ ধরি।

হল ও মুষল দিল দুই করে, পৃষ্ঠে দুলায়ে শিঙ্গা ;
নিশা-জাগরণে নয়নযুগল স্বভাবেই ছিল রাঙ্গা।
মধুপানাবেশে বলরামে এসে যেই রূপ রস ধরে ;
আজি দেখা যায় আসিয়া রাধায় সে ভাব ভাবিত করে।

সেই রাঙ্গা রাঙ্গা আঁখি, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভঙ্গি ধরিয়া আছে,—
সহসা দেখিয়া সম্ভ্রমে সরে' যায় রামাগণ পাছে !
মধুরে ও বীরে কোলাকুলি করে রাধার শ্রীরূপমাঝে,—
দৃঢ়তা আসিয়া দাঁড়ায় অগ্রে, জড়তা পলায় লাজে।

অপরূপ আজ হ'ল হলধর, শ্রীরাধা বৃন্দা-করে ;
যৌবন-মদগর্ব্বিত গতি, লাজে মার পদে মরে।
দেখি' নতশির হইল কবির, সজল যুগল আঁখি ;
স্তব্ধা ভারতী করিল আরতি রাম-রসায়ন চাখি'।

জয়-যাত্রা

রাধা পায় বল সাজি' অবিকল বলদাউজীর রূপে ;
নাম-অভিরাম শকতির ধাম প্রাণে নেমে এলো চুপে।
এলো যথার্থ যেন হলধর শ্রীরাধা-কুঞ্জে আজি,
সব সখী মিলি' করে রাখোয়ালী ঠিক্ সখা-সাথী সাজি'।

করিল যাত্রা স্মরি গোবিন্দে দাউজীবেশিনী রাধা,—
কৃষ্ণের নাম যাঁর অবিরাম জীবনে মরণে সাধা।
নামের প্রতাপে বলরাম-রাই নামীরে জিনিতে যায়,—
এই মহাভাব, ভাবুক না হ'লে বুঝাই বিষম দায়।

নামের মহিমা জানেন রাধিকা নামী হতে বড় করি ;
নামী দেয় জ্বালা, আসি নামমালা লয় সে যাতনা হরি'।
নাম সৎ, নাম চিৎ আনন্দ, নাম শ্রীচিন্তামণি।
হ'য়ে অভিন্ন জীবের জন্য নামেরে অগ্রে গণি

নামী থাকে পিছে, হয় সব মিছে নাম না দাঁড়ালে আগে।
নামের গ্রহণে বিগ্রহে আসি নামী-গোবিন্দ জাগে।
নাম শাশ্বত, চিরজাগ্রত, দাসে প্রদানিতে হরি
হয়েছে প্রতিভূ বিভুর নিকট স্বরূপ সর্ত্ত করি।
সদা বিশুদ্ধ, হয় সুসিদ্ধ কালাকাল নাহি মানি ;
সিদ্ধ শ্রীনামে হয় না বিদ্ধ অঙ্গহানির গ্লানি।
নামের আভাসে মুক্তি আসিয়া লয় আশ্রিতে বরি ;
নাম-অনুরাগে ভক্তি হয়েন সেবকের সহচরী।

বেড়ায় ভক্তি সহিত মুক্তি শ্রীনাম-দাস্য আশে ;
বন্ধন আসি দিতে নারে ফাঁসি মুক্ত নামের দাসে।
এহেন শ্রীনাম, নয়নাভিরাম নামীরে আনিতে চলে
নব ঘন হয়ে রাধার হৃদয়ে ভরি প্রেমাম্বুদলে।

শ্বাসে প্রশ্বাসে মহাউচ্ছ্বাসে হয় সে নামোৎসব,—
নাম-সিন্ধুতে ডুবে গেল সব বিশ্বের অনুভব।
শ্রীনাম-মদিরা-পানে প্রমত্তা টলে পড়ে চলে যেতে,—
ঢল ঢল আঁখে চাহে যেই দিকে, যায় সেই দিক্ মেতে।

বাহুর হেলনি কটির দোলনি মথে মন্মথ-মতি,
তাই কুসুমেষু ইষুধি ফেলিয়া পলায় শীঘ্রগতি।
কৃষ্ণে স্মরিয়া চলেন রাধিকা উষায় লইয়া পাশে ,
এলাইত কেশ গুটায়ে কবরী বাঁধি' নিশা যায় বাসে।

পুষ্যা আসিয়া শুনায় লগ্ন সিদ্ধিদাতায় স্মরি',
রবি-জায়া ছায়া দাঁড়ায় আসিয়া পতিরে পিছন করি' ;
ভোরের বাতাস আসি' আশ্‌পাশ করিল শুদ্ধ শুচি,
কালো জল দিয়া দিল' কালিন্দী সৈকতখানি মুছি' ;

ফুলভার ল'য়ে লতিকানিচয়ে নমিয়া পড়িল পায়ে,
সুরভি লভিয়া আইল ধাইয়া, সুরভিরা গায়ে গায়ে,
বন্দীর মত বন্দনা গায় নন্দিত শুক শারী,
নীল অম্বরে সম্ভাষে আসি' শিখী-সুপুচ্ছধারী ;

ছল ছল আঁখে মৃগী চে'য়ে থাকে,—দীঘল নয়ন দুটি,
সারস আসিল সারসী সঙ্গে সরসী হইতে উঠি' ;
থমকি' দাঁড়ায় মরালী তথায় গতির গর্ব্ব ছাড়ি',
ভৃঙ্গীরে রাখি' গৃহের কর্ম্মে ভৃঙ্গ ছাড়িল বাড়ী ;

কোকী আর কোক ত্যজি' নিশা-শোক, উষায় প্রণমে আসি';
দেখি' বলরামে, দক্ষিণে বামে করি' প্রশংসারাশি
উড়ি' চলে সাথে,—যে যাতনা রাতে ইঙ্গিতে তাহা বলে,—
"দীর্ঘ বাসর কর হলধর" বলি ভাসে আঁখি-জলে !—

ভেঙ্গে' গেছে গলা, সারা নিশাবেলা "পিউ কাহাঁ" বুলি বলে'—
তাই সে পাপিয়া নিঝুম বসিয়া ঝিমায় শাখীর কোলে !
অবসাদহীন কূজনে প্রবীণ চূত-মঞ্জরী চুমি',
কুহরণ-লীলা করে দুই বেলা মুখরি' কাননভূমি.

পরভৃতগণ করে বিচরণ প্রহরী হইয়া বনে,—
মধু-মদনের অনুচর বলি' কাহারেও নাহি গণে ;
কিন্তু শ্রীহলী আসিছেন চলি',—শুনি সুরভীর কাছে,
পঞ্চম তানে বন্দনা-গান ধরিল বসিয়া গাছে !

ডাকিছে পক্ষী, ছাড়ে নাই বাসা, আলো ও আঁধার মাখি'
দেয় পাখা-ঝাড়া, পে'য়ে সেই সাড়া শাবকেরা উঠে ডাকি' !
মন্থর পায়ে আকাশের গায়ে বিদায়ের ছবি আঁকি',
নিশা যায় চলে' সুনীল নিচোলে শ্যামল সুতনু ঢাকি',

শর্ব্বরীনাথ ছাড়ি' প্রিয়াসাথ পশ্চিমে পড়ে ঢুলে',—
স্নিগ্ধা অবনী, চাহে দিশাবাণী ঈষৎ ঘোম্‌টা তুলে',
দুলায়ে দুকূল তুলে তারা-ফুল দিক্‌-বধূগণ এসে',
বঁধু-মুখ চাহি' ছায়াপথ বাহি' নিশা যায় শ্লথ বেশে ;

ক্ষীণ কটি হ'তে খসিয়া মেখলা শ্রোণিমণ্ডলে দুলে,
ঝিল্লী-নূপুর চরণে বাজিছে বিরহের সুর তুলে' ;
বুকে আঁকা বিধু, মুখে রাখা শীধু, প্রাণে ঢাকা মধুরাশি,
যায় গো যামিনী না ফুরাতে বাণী আজি অভিসারে আসি'!

তা'র আঁখি-নীর হইয়া শিশির পড়িছে ভূতল ছে'য়ে,
বহে ঝিরঝির শীতল সমীর বিদায়ের গান গে'য়ে ,
নিশা-সঙ্গিনী শেফালী কামিনী বিষাদে পড়িছে ঝরি',
প্রিয়ের বিরহ কত যে অসহ,—কহে তা' মরণে বরি' !

অস্ত-অচলে নিশা যায় চলে', উদয়ে উদিল উষা,—
জাগায় যতনে যত অচেতনে বাজায়ে চরণ-ভূষা।
শিতান ত্যজিয়া শিল্পী উঠিয়া তুলি' লয় তুলিখানি,
রেখা-অঙ্কনে ফুটায় যতনে নিশার বিদায়-বাণী।

লালসা পলায় বিলাসের সাথে তামসী নিশির শেষে ;
ক্ষৌমবসনা জাগে উপাসনা যতির হৃদয়দেশে।
বিশ্বপাতার পূজাসম্ভার সাজান্‌ প্রকৃতিসতী
জড় ও চেতন জগৎমাঝারে যতন করিয়া অতি,—

শিশিরের জল পাদ্য-অমল দুর্ব্বা বহিছে শিরে,
রক্ত জবার অর্ঘ্য সাজায় বনদেবী ধীরে ধীরে,
পূত আচমন করিয়া বহন যোগান্ যমুনারাণী,
শ্যামলা পৃথ্বী বক্ষ বিথারি' পেতেছে আসনখানি ;

জাগি' যোগীজন, করে আবাহন রবিমণ্ডলে স্মরি'—
সরসিজাসনে সমুপবিষ্ট কমল-নয়ন হরি !
কীচক-রন্ধ্রে গভীর মন্দ্রে বেজে' উঠে সামগান,
স্বস্তিবাচন শুক-পিকগণ করে ধরি' কলতান ;

করিছে বীজন পবন গগন-চন্দ্রাতপের তলে,
জগন্মোহনে পূজেন প্রকৃতি মোহিনী উষার ছলে !
—এহেন উষায় বলরাম যায় বন-বিহারের বেশে,—
হইয়া সান্ত যেন অনন্ত এসেছে কাননদেশে ।

তাই কিশলয় মুখ চাহি' রয়, পল্লব নমে পদে,
মাতে ঝরা ফুল সে পদ-রাতুল বুকে ধরি' মহামদে ;
শ্রীপদ-কমল ধরে ভূমিতল কোমল হইয়া অতি,
সহ সহচর চলে হলধর লীলায় করিয়া গতি ।

তিরস্কৃত নীলমণি

পশে বলরাম চন্দ্রার ধাম "হাঁরে রে কানাই" বলে',—
বিষাণ পূরিয়া দিল ফুৎকার ঘনগম্ভীর রোলে !

গেল নব রস সব রসাতলে, স্তব্ধ হইল সভা,—
উদিল যেন গো, তরুণ তপন প্রকাশি' অরুণ-প্রভা।

বলরামে দেখি' যতসব সখী যায় পলাইয়া ভয়ে,
অগ্রজে দেখি' কৃষ্ণ দাঁড়ায় কাষ্ঠ-পুতলি হ'য়ে ;
মুখে নাহি বাক্, হইয়া অবাক্ চাহে ভূমিতল পানে,
সুবোধ শান্ত হইয়া কান্ত, ক্ষান্ত হইল গানে।

চন্দ্রা পলায় তন্দ্রা ছাড়িয়া, গেল' ছুটে' সব নেশা ;
করতালি দিয়া হাসে রাখালিয়া দেখি' সে বিবশবেশা!
পদ্মারে ধরে শ্রীদাম ধাইয়া, বলে, "এরে বাঁধ ভাই,—
দুষ্টা এ নারী-তস্করে ব্রজে রাখিলে কুশল নাই!

মুণ্ডিতশির করিয়া তক্র ঢালি' দাও গালে কালি :
কুট্টনীব্রজে কেমন মাধুরী, তবেই বুঝিবে আলী।
রাসভবাহন করিয়া ভ্রমণ করাও পল্লীমাঝে,—
চোর নারীগণ হবে সচেতন দেখি' এই লোকলাজে!"—
বলে বলরাম, "ওরে, চোর শ্যাম, একি তোর আচরণ,—
সুযোগ পাইয়ে এসেছ পলায়ে করিবারে কীর্ত্তন (?)।
নারীর মাঝারে কর' নাগরালী, তাহা তো জানি না আমি ;
আমাদের পাশে থাক শিশুবেশে, হেথায় চন্দ্রা-স্বামী।

ইতরের মত এই আচরণ রাজ-কুলে দিল' কালি,
আয়, দেখি তোরে কে দিল' শিক্ষা করিতে এ নাগরালী

হ'য়ে অতি ভীত হয় কম্পিত, যায় পায় পায় কাছে ;
ভাবে নীলমণি, এখনো কি জানি কপালে কি গতি আছে।

ধরি' বাম কর, দক্ষিণ করে দিল' হলধর টান,—
করি' মাথা নীচু যায় পিছু পিছু ভক্তের ভগবান্ !
দেখে এই ছবি নির্ব্বাক্ কবি বিস্মিতা বাণী সনে,—
সম-শশী-ভানু, যায় রাম কানু মিলি, সখা-সখীগণে !

পথে আসি' রাম বলে "রে শ্রীদাম, আমি থাকি এইখানে,
চন্দ্রা-কুঞ্জ ভেঙ্গে' এলে তুই যাব', সবে গৃহপানে।
আর, ওই ধৃতা ধৃষ্টা নারীরে বেঁধে' রেখে' আয় গাছে,
অবসরমত উহার বিচার করিতে হইবে পাছে।

আগে ঘর শোধি, পরে পর-কথা, গোপালে শিখাব' আজ ;
কুলার বাতাসে কুলটাগুলারে কাল দিতে হবে লাজ।"
মৌখিক ভয় দিয়া ইঙ্গিতে বলরাম করে মানা,—
দয়ার আধার প্রাণ শ্রীরাধার, এইবার গেল' জানা !

দিল' এক টান বৃন্দা-শ্রীদাম পদ্মার ঝুঁটি ধরে',—
পদ্মা কাঁদিয়া বলে, "ছেড়েদে রে, ক্ষীর সর দিব তোরে !
বল্ কিবা দোষ আমার, শ্রীদাম, আমি তো চন্দ্রা নহি ;
যাহা বলে, তাই দাসী-অভিমানে মস্তক পাতি' বহি !"

শ্রীদাম-বৃন্দা বলে, "চাতুরালী আমার সহিত ফের,
দাসীর কীর্ত্তি জাহির হইলে মজাটি পাইবি টের !

রাধাসতী বিনা এই ব্রজে আর কার আছে প্রভুপনা ;
ছিদ্র কুম্ভে সলিল আনিতে পেরেছে বা কোন্ জনা ?

সকল রাখালে সকালে বিকালে নমে রাধিকায় পায়,
ব্রজে যত জন আছে এমন, রাধিকায় যে না চায় ?
এই যে কৃষ্ণ পেয়েছে জীবন, এ জীবন শুধু তাঁর,—
আমাদের হাতে গচ্ছিত ধন বিনা কিছু নহে আর।

সেই কানু তুই করিস্ হরণ কুঞ্জ-কাননে গিয়া ;
এবে সেজে' সতী চাস্ নিষ্কৃতি ক্ষীর সর পুরী দিয়া !
যেমন কর্ম্ম, ফল সেইরূপ পাইতেই হবে এবে,
উৎকোচ দিয়া নিষ্কৃতিলাভ কিছুতেই নাহি হবে।"

এত বলি' দ্রুত যায় কেশে ধরি', পদ্মা ফুকারি উঠে,—
"প্রাণে মরি, ক্ষমা কর্ রে শ্রীদাম" বলিয়া ধূলায় লুটে !
দয়ার সেবিকা ভক্তা বৃন্দা, দয়া উপজিল মনে,—
প্রেমিকের প্রাণ চিরক্ষমাশীল দীন পদানত জনে।

শ্রীদাম তখন বলিল বচন, "তবে ক্ষমা করি আমি,
কায়-মনে যদি হ'তে পার' কভু শ্রীরাধার পদকামী ;
চন্দ্রার সহ হও রাধা-দাসী, লও আশ্রয় তাঁর ;
তবে হবে সব কুশল ; নতুবা করিব ব্রজের বা'র।

কৃষ্ণের সহ রাখালসকলে মানে রাধিকায় প্রভু,
সে প্রভুর সেবা ভিন্ন কাহারো কল্যাণ নাই কভু !

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ ত্যজিয়া থাক' গিয়া রাইপাশে—
দুইটি কুঞ্জ রাখিলে বিরোধ, ব্রজের শান্তি নাশে!"

সভয়ে পদ্মা বলে করযোড়ি "আজ হ'তে হবে তাই,—
এবে রাখ' প্রাণ, আর কুল-মান, পায়ে ধরে' ক্ষমা চাই!"
শুনি' এই কথা, বৃন্দা তখনি ছাড়ি' দিয়া কেশমুঠি
বলে, "এইবার প্রণম' রাধার চরণোদ্দেশে লুটি',

বল', 'জয় রাধে, শ্রীরাধে' বদনে, হবে সব দুখনাশ,
করুণা-তটিনী, তা'রে নাহি চিনি' কূপোদকে কর আশ!"
পদ্মা লুটায় ধরণীর গায় "জয় শ্রীরাধিকা" বলি';
বৃন্দাও যায় পদ্মাবতীর সকল গর্ব্ব দলি'।

হেথা বলরাম ল'য়ে ঘনশ্যাম, যায় বনপথ ধরি',—
কাঁপে দুরুদুরু দাউজীর ভয়ে ব্রজচন্দ্রমা-হরি!
দাদার ভয়েতে হ'য়ে আধাসার ভুলে' গেছে নিজ নাম;
অন্তর্য্যামী বুঝিতে পারে না, এটি জাল বলরাম!

ছাড়ি' পদ্মায় আসিল তথায় শ্রীদাম-বৃন্দাবতী;
বলে হলধর, "এই দুষ্টের বল্ কি করিব গতি!"
শ্রীদাম হাসিয়া বলে, "ওগো, দাদা, যদি শুন মোর কথা,—
এই নিশাচরে ল'য়ে যাও ধরে' পিতা গোপরাজ যথা!

আমরা রাখাল রাখি গাভীপাল, সারাদিন খেটে' মরি;
ইনি বসে' খাসা দেখেন তামাসা করেতে বংশী ধরি'!

মাঠের হাওয়ায় দিনেতে ঘুমায়, রাতে নাগরালী করে,—
এঁর গুণপনা মোরাই জানি না, কেমনে জানিবে পরে!

যাহার কারণে ব্রজরামাগণে কুললাজ দেছে ছাড়ি',
ব্রতধ্বংসী সে কাল-বংশী কর হ'তে লহ' কাড়ি!"
ছিল নতশিরে, এবে ধীরে ধীরে হেরে হরি-বাঁকাআঁখি,
ভাবে শ্রীগোপাল,—এইটাই কাল, এনেছে দাউকে ডাকি'!

কিন্তু উপায় না হেরি এখন, পড়িয়াছি এবে ধরা;
দাউজীর হাতে শেষ হ'ল আজ কুঞ্জ-বিলাস করা!—
শ্রীদামের কথা শুনিয়া বলাই বলে, "ঠিক্ কথা তোর,
পাউক শাস্তি রাজার সভায় আজি এই কানু-চোর!

নিশা-জাগরণে করে কৃশ তনু, দোষ হয় মোর নামে;
গোঠে গিয়া ওরে করি অযতন, ভাবে সবে ব্রজধামে!
চল্‌রে দুষ্ট চৌর কৃষ্ণ, আজ পাবি তা'র সাজা,
'পেশাদার' বলে' লিখে' তোর ভালে, শিকলে বাঁধিব মাজা!"

হাতে দিয়া টান হয় আগুয়ান গৃহমুখে করি' গতি,—
চৌর্য্য-প্রকাশ, লোক-উপহাস কৃষ্ণের হরে মতি!
নতুবা বুঝিত দাউজীর চিত এরূপ কঠোর নয়,
শ্রীদামও এমন ছিল না কখনো কৃষ্ণেরে নিরদয়!—

শ্রীপতিরে আজ শ্রীমতীর মায়া করিয়াছে আবরণ;
যত বাহুবল গেছে রসাতল করি, কর-পরশন!

অজ্ঞাতসারে শক্তিভিতরে শক্তি গিয়াছে চলে',—
না দেখিয়া হাত, শ্রীজগন্নাথ ভাসে শুধু আঁখিজলে।—

ব্রহ্ম-মোহনে জানে জগজ্জনে কৃষ্ণের কত বল ;
সঙ্কর্ষণও বোঝেনি তখন বিষ্ণুমায়ার ছল !
নব লাখ গাই সেজেছে কানাই, আর সখা-সাথী যত ;
নিজে অনন্ত না পে'য়ে অন্ত ছিলেন ভ্রান্তমত !

সেই মায়াময় আজ মায়াবিনী-পরশে মূর্চ্ছাতুর,—
বৈষ্ণবী মায়া বিষ্ণুমায়ার করেছে দর্পচূর !
দেখায় বিশ্বে আজ এ দৃশ্য যাতুকর যাতুকরী ;
ভক্তির বল প্রবল করিয়া লঘু হইলেন হরি !

পরাজিতা আজ ব্রহ্মের মায়া, বিজিত ব্রহ্ম-হরি ;
অচলা ভক্তি দেখায় শক্তি সচলা মূর্ত্তি ধরি' !
কৃষ্ণ-মোহন করেন শ্রীরাই, বলাই সাজিয়া আজ,—
ফেলিয়া যেন গো, মূষিকের কলে তুর্দ্দম পশুরাজ !—

যাক্ সে কথায়, দেখে কানুরায়, গৃহমুখে যায় দাদা,—
কাঁদি' হাউ হাউ, বলে "দাউ দাউ"—জড়িত শব্দ-আধা !
বলে, "এ কর্ম্ম করিব না আর, শপথ করিয়া বলি ;
গোকুলে আমার আছে যে সুযশ, দিওনা তা' আজ দলি' !
পদে ধরি আজ, দিও নাগো, লাজ, শুন' এ মিনতি মোর",
ইহা বলি' হরি শ্রীচরণ ধরি' বরিষে লোচন-লোর !

নয়নসলিলে ভিজিয়া চরণ চন্দন গেল ভেসে',—
স্বর্ণ-কান্তি করে ঝক্‌মক্‌ প্রভাত-কিরণে হেসে !

পরে দেখে কানু, চরণে যাবক, বাম পদ আগে চলে ;—
দেখি' সন্দেহে চাহে গোবিন্দ মুছিয়া নেত্রজলে !—
পদানত দেখি' শ্রীমতীর মায়া দয়াস্রোতে গেছে ভাসি',
গুটাইয়া জাল ছাড়িয়াছে হাল কূলেতে নাবিক আসি' !

প্রভাত-কিরণে চাহি' মুখপানে, দেখে,—এতো নহে দাদা !
এযে 'বল'-বেশে হয়েছে সচল অচল মানিনী রাধা !!
ভাব সংযত করি' বলে কানু, হায় "একি দেখি দাউ !
তোমার চরণে যাবক পরায়, দেখি না ত' হেন নাউ !

আমি পেশাদার, তুমি কী এবার খুলে' বল' তাহা প্রভু ;
লিখে' রাখি তব চরণের তলে, রহিবে চিহ্ন তবু !
আমার ললাটে, তোমার চরণে থাক্‌ ব্যবসার নাম ;
নব বাণিজ্যে তা' হলে মোদের বাড়িয়া যাইবে দাম !"—

ফাঁসিয়া গিয়াছে দেখিয়া, হাসিয়া করে দিয়া করতালি
বল্লরীসবে বলে, "বাঁধ' এবে নব নটবরে আলী !"
হাসে মৃদুমৃদু সে নাটুয়া বঁধু সখীদের কথা শুনি' !
সে ললিত হাস বাণী-বীণে আসি' দিল সুরজাল বুনি'।

ললিত প্রভাতে প্রভাতি'র সাথে ফুটায়ে কলিকাদলে
'ললিত' রাগিনী সুললিত বাণী সবিতাদেবেরে বলে।—

শ্রীরাধারমণ বলে, "সখীগণ, বাঁধিয়া বাহুর পাশে,
ক্ষমি' অপরাধ, ভ্রম ও প্রমাদ, চরণে রাখিও দাসে।

এবে রাখ' পাশে এই ক্রীতদাসে প্রণয়ে পোষণ করি',
পশুন হোয়ো না কভু পিপাসিতে চরণ-সেবাটি হরি'।"
বলি, রাই-গলে ধরি' কানু বলে, "ক্ষম' গো, প্রাণেশ্বরী ;—
বলরাম-রাই না হেরি' কানাই দাঁড়াল' পিছন করি'!

যে দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় রাধিকা, সেই দিকে যায় হরি,—
কপোত কপোতী দেখি' সেই গতি লাজে যায় প্রাণে মরি'।
চক্রের মত হয় ঘূর্ণিত অভিনব এই শোভা,—
রাই কানু যেন বলাই কৃষ্ণ, মিলনে চিত্তলোভা!

আধ' কৌতুকে হাসিছে বৃন্দা আধ' শঙ্কিতা ত্রাসে ;
রাই-চন্দ্রমা মহামান-রাহু গ্রাসিছে মহোল্লাসে!
দেখি' এই ছবি, জয়দেবকবি পুলকাঞ্চিত দেহ ;
নয়ন-কমলে অশ্রু উছলে,—কিহেতু জানে না কেহ!

আরতির দীপ রাখিয়া ভারতী বীণাটি লইল তুলে' ;
আবেশে অবশ 'ভৈরব'-ভোলা ভূমিতে পড়িল ঢুলে'!
সপ্তস্বরায় জাগিল ত্বরায় 'গুণকিরী'-মানময়ী,—
লুটায় ভূতলে—বধূ-পদতলে ভৈরোঁ-ত্রিলোকজয়ী!

খণ্ডিতা * রাধা

মানিনী রাধায় রাগিণী কাঁদায় আজি বেদনার সুরে,
হ'য়ে মুখোমুখি যেন দুই সখী সমদুঃখেতে ঝুরে।
সপ্ত সুরের আলাপে তথায় বিলাপ ভাসিয়া আসে ;
সাধিয়া শ্রান্ত সুধীর কান্ত, সখীগণ কাঁপে ত্রাসে !

গত অপমান হয় আগুয়ান সোহাগের সাড়া পে'য়ে ;
অপ্ পশে গিয়া আঁখির ভিতরে, মান যায় হৃদি ছে'য়ে !
মানিনী হইল শ্রীমতী রাধিকা আজি বহু মান লভি'—
ধন পেলে লোকে হয় ধনাঢ্য, মানেতেও সেই ছবি ।

পরশ-পাগল পরশমণির পরশন-সুখ পে'য়ে,
অভিনন্দিতা রাধার নিকটে অভিমান এল' ধে'য়ে !
গ্রীষ্ম প্রবল, মেঘভরা জল, বরিষণ নাহি করে,
পবন-সোহাগে পড়ে মহাবেগে ঝরিয়া ধরার পরে,—

তেমনি রাধার বেদনার ভার গুমরিয়া ছিল মনে ;
হ'য়ে মেঘভাঙ্গা ডুবাইল ডাঙ্গা সোহাগ-সম্মিলনে।
জগবন্দিত নন্দের সুত মানীর বাড়াল' মান ;
ধনী হ'ল ধনী চিন্তামণির পে'য়ে প্রেম-অবদান।

তাই গরবিনী হইয়া মানিনী পশে নিকুঞ্জে গিয়া ;
বসে ঢাকি' তা'র বদন-সুচাঁদ নীল অম্বর দিয়া !
গিয়া পাছে পাছে চকোর যাচিছে একটি বিন্দু সুধা,—
কিন্তু মেঘেতে দেয়না ক্ষুধিতে মিটাতে দারুণ ক্ষুধা।

সকরুণ চাঁদ হ'য়ে অকরুণ লুকায় মেঘেব আড়ে ;
প্লবমান মান-নীরদপুঞ্জে কুঞ্জে আঁধার বাড়ে !
লাঞ্ছিত করে বাঞ্ছিতে আজ মানিনীর অভিমান,—
নূতন মাধুরী আস্বাদে হরি পে'য়ে এ ব্যথার দান !

বলে মুর-অরি, "শুন, রাধাপ্যারী, অপরাধী আমি নই ;
বৃথা করি' রোষ দেখিতেছ দোষ আজি এ দাসের, সই !
ঊষায় ভ্রমণ করি' সারা বন, ফিরিতেছিলাম ঘরে,
সহসা পদ্মা আসিয়া আমায় ল'য়ে গেল ছল করে' !

ভদ্রকালীর পূজা-পার্ব্বণে করে তা'রা জাগরণ ;
প্রসাদ দিবার ছলে আসি' মোরে করিল নিমন্ত্রণ !
শুন', প্রাণসই, আমি ইহা বই আন কিছু নাহি জানি ;
সত্যাসত্য বুঝিয়া বিচার করিও কিশোরী রাণি !

কাল অভিসার করিতে আমার দৈব হইল বাদী !
গৃহেতে অতিথি—কতিপয় যতি ছিলেন গর্গ আদি।
তাঁহাদের সেবা, আর দেবী-দেবা পূজিতে হইল ঊষা ;
—সন্ধান করি' দেখিও সত্য, জরঠা-জটিলা-স্নুষা !

আমি নিশি-শেষে তব উদ্দেশে আসিয়াছিলাম বনে,
এহেন সময় দেখি পদ্মায় শৈব্যাসখীর সনে।"—
লতা-বল্লরী ধরি' বল্লবী বলে বল্লভে বাণী ;—
"সখি, বল ওর কপট চাতুরী আমরা সকলি জানি !

কৈতববাণী বলিতে কি হানি, যার নাই কোনো ভয় ;
বাজায়ে শঙ্খ দেয় অসংখ্য মিথ্যার পরিচয় ।
শঙ্কাশূন্য, পাপ ও পুণ্য সমান যাহার কাছে ;
কৈতববাণী ভিন্ন তাহার সঙ্গিনী কেবা আছে ।

দ্বাপরের শেষ হ'লে হৃষীকেশ, আসিবে যখন কলি ;
তখন তোমার অনৃততার হইবে সুসার, অলি !
এবে দুইপাদ আছেন শ্রীপাদ ধর্ম্ম দ্বাপর বলে',—
করিবে ভ্রমণ একেতে তখন কৈবত-কলি হ'লে !

'অতিথির সেবা, আর দেবী-দেবা পূজিতে হইল উষা'—
কষায়িত আঁখি দেখে' বুঝ সখি, আর বিগলিত ভূষা !
সিন্দূর ভালে কজ্জল গালে,—কালিকার পূজা করি'
বক্ষ চিরিয়া দিয়াছে রুধির কনক-কটোরা ভরি' !

লভি' তাঁর কৃপা পেয়েছে শিরোপা নীল অম্বরখানি ;
দেবীর চরণে যাবক পরায়ে রঞ্জিত যুগ পাণি !
যথা শোভা পায় নিকষের গায় কষিত কনক-রেখা,—
দেখি, সেইমত হৃদে অঙ্কিত চারু চন্দ্রালি-লেখা !

উহা শশিভাল দিয়াছেন কাল, নিজ ভাল হ'তে তুলি' ;
দেবীর বোধনে বাজায়ে শঙ্খ,—অধরের ক্ষতগুলি !
সঙ্গিনী সাথ নাচি' সারারাত, হয়ত' নৃত্যকালী
দিয়াছে চরণ বক্ষে তুলিয়া ভাবিয়া অক্ষমালী !

তাই বুকে আঁকা আলতায় মাখা কোমল চরণতুটি।
—ভক্তির ভাব পুলক-প্রকাশে অঙ্গে উঠিছে ফুটি' !—
নহি মোরা কালী, কিম্বা কপালী, কমলা-কমলমুখী ;
আমরা অবলা, সুধু গোপবালা—মদন পীড়নে তুখী !

কমলনয়ন ! তবে অকারণ করিও না আর দেরী,
তব চণ্ডিকা ভাবিছেন একা, আপন দাসে না হেরি' !
সে মহাবিদ্যা সবাই স্নিগ্ধা, আমরা প্রখরা বালা ;
কৃপাময়ী তারা হ'য়ে তোমাহারা সহিছে কতই জ্বালা !

সেই ভুবনেশী—ষোড়শী সুকেশী ; আমরা কুরূপা নারী ;
ভৈরবী-ভীমা হ'লেও সে বামা তোমার, তুমিও তারি !
মোরা পরনারী, অতএব হরি, যাও ত্বরা করি তথা,—
পাবে বরাভয়, হে সুখনিলয়, সেবি' সে কল্পলতা !"—

কহে বেণুপাণি, "শুন', রাইরাণি, কর' মোরে অপমান,—
তাহে নাই হানি, সুধু দাস মানি' কর' যদি কৃপাদান !
দণ্ডিত করি' করেন প্রসাদ,—প্রভুর স্বভাব জানি ;
তুমি সেই প্রভু-মহিমান্বিতা, শুন, ও কিশোরী রাণি !"—

বলি' এই কথা, বিশ্বের পিতা রহে যোড়কর করি',—
রাই নতমুখে রহে মহাতুখে, না হেরি' প্রাণের হরি !
মূক সখীগণ করে দরশন অভিনব এই ছবি ;—
ভারতীর সনে শঙ্কিত মনে রহে জয়দেব-কবি !—

সাধিয়া কাঁদিয়া নব নটবর অবশেষে গেল' ফিরে'
—যখন দেখিল, তপন-কিরণ কানন ফেলিছে ঘিরে'।
যাইবার কালে, বলে সখীদলে, সুদীন কমলআঁখি,—
"যাই, সহচরী, বুঝাইও প্যারী, আমার পক্ষে থাকি'।
আমি অনুগত তোমাদের যত, এত আর কারো নয় ;
জানি' নিজ জন, করায়ো স্মরণ,—দাসের এ অনুনয় !"—
যায় চলি' কানু, সমুদিত ভানু,—অনুমানি' ধনী চাহে ;
উঘারি' শ্রীমুখ পায় মহাদুখ না দেখি' জীবননাহে !

কলহান্তরিতা * রাধা

নিশায় মুদিয়া ছিল যে নলিনী অলিরে বক্ষে বাঁধি',
দিবসে তাহারে না হেরি' নীহার-ছলেতে উঠিল কাঁদি' !
"বলি' "হায় হায়" লুটায় ধূলায় বিধুরা অধীরা বালা,—
কৃষ্ণ-মিলন-বিনা যার ক্ষণ ঢালে কালকূট-জ্বালা !
তিলেক বিরহ যাহার অসহ, সেই আরাধিকা রাধা
চিরআরাধ্যে করি' অনাদর, এবে পাগলিনী-আধা !
বলে সখীদলে, "মিলিয়া সকলে উড়ালি কি প্রাণ-পাখী ?
যবে গেল' চলে', কেন সই কালে না আনিলি তোরা ডাকি'।
আমার না হয় হয়েছিল রোষ, তোরা কি ঘুমিয়ে ছিলি ?—
দেখি' উপাস্তে, উপাসিকা হ'য়ে বসিতেও নাহি দিলি !"
জয়দেব ভাবে,—এই মহাভাবে কি ভাবে ফুটাবে ভাষা !
বঁধু এলে মান, না আসিলে প্রাণ ছেড়ে' যেতে চায় বাসা।

কমলের বুকে বসি' অধোমুখে বাণী ভাবে এই বাণী।
'আশা' বনে বনে বাজে বেণুস্বনে, বলি', "ও কিশোরী রাণি।"
কাঁপে তিন পুর, সে করুণ সুর শুনি' গলি' যায় শিলা,—
কাঁপি' থরথর হেরে কবিবর পাষাণ-গলান লীলা!—

আসিয়া বৃন্দা, বলে, "কি নিন্দা, লাজ নাই কিগো, কিছু!
পুন হেন বাণী বল, কুবচনী,—কাটে যেন তায় বিছু!
পাইয়া রতন, করি' অযতন নিজে হারায়েছ নিধি;
এবে পরে দোষ দিয়া কর রোষ,—হায় রে, দারুণ বিধি!

নিশার বিরহ ভুলেছিলে বুঝি নেশার আবেশে থাকি'?
এবে ছুটে' নেশা, লভি' সেই দশা দোষী কর সবে ডাকি'!
আমরা এবার তব ব্যবহার বুঝিলাম ভাল করি',—
থাক' তুমি মানে, মোরা মানেমানে নিজ নিজ পথ ধরি।"

ললিতা আসিয়া অললিত আঁখে চাহি' শ্রীরাধার প্রতি,
বৃন্দারে বলে, "যা বলিলে, তাহা সত্য, বৃন্দাবতী!
আমরা সরলা, সহি কেন জ্বালা বৃথা এ কাননে আসি'—
ত্যজি' গৃহ স্বামী জাগি সারাযামি কুলের ভরম নাশি'!

যার গৃহ নাই, থাকুক তা'রাই রাধিকার সেবা ল'য়ে,—
সুখের ভবন ত্যজি' কি কারণ থাকি মোরা দুখ স'য়ে!"
আসিয়া বিশাখা, করি' ভুরু বাঁকা, বলে, "শোন', সহচরী,
যেথা অপরাধ, গুরু-অপবাদ, নিন্দিত যেথা হরি,

সেথা যেবা থাকে, প্রেম প্রীতি রাখে,—তা'র হয় অধোগতি।
সেই পাপে আজ গোপিকা-সমাজ দূষিতা হয়েছে অতি!
বিশ্বের গুরু সে কল্পতরু গেছে আঁখিনীর ঢালি',—
চান্দ্রায়ণের প্রয়োজন এবে হয়েছে মোদের, আলী!"

বাড়ায়ে মাত্রা বলিল চিত্রা, নাচাইয়া যুগ ভুরু,—
"সত্য, বিশাখে, কৃষ্ণচন্দ্র হন জগতের গুরু।
সে গুরু-নিন্দা সম্মুখে থাকি' শুনেছি আমরা সবে,—
প্রায়শ্চিত্ত বিনা এ চিত্ত চির-কলুষিত র'বে!

চন্দ্রার গেহে সুস্নাত দেহে করিব চান্দ্রায়ণ,
চল', সখী, সবে যমুনায় এবে ত্যজি' এ দূষিত বন।"
"চন্দ্রা-ভবন সুখের সদন"—কহে, চম্পকলতা—
"নাই হাহাকার, বেদনার ভার, নাই তথা ব্যাকুলতা।

সদা নব রসে পূজে হৃষীকেশে রসিকা চন্দ্রাবলী,—
পড়ে না কখনো মহামান-ফণী-বিষদংশনে ঢলি'!
মোরা গোপনারী, কেন কেঁদে' মরি এ রাধা-কুঞ্জে আর!
হেথা দুই সাপ—বিরহ ও তাপ ঢালে সুধু বিষধার—"

"তাই বার'মাস সুধু হা-হুতাশ" কহিল সুদেবী আসি',
"চন্দ্রাবলীর নাই মানামান, ক্ষয়েতেও হাসে হাসি।
ভানুর কন্যা হউন ধন্যা মহামান, তাপ ল'য়ে,—
আমরা আহিরী কেন জ্বলে' মরি সে তাপে তপ্ত হ'য়ে!"

করে উপেক্ষা সমবিপক্ষা রাধা-সহচরী যত,
দুর্দ্দম মহামান-মাতঙ্গে করিতে সুসংযত।
বচনাঙ্কুশ-প্রহারে তাহার ফিরায়ে বক্র গতি,
সংযত করে সখীগণ সহ চতুরা বৃন্দাবতী।—

চিরআদরের আদরিণী রাই অনাদর পেয়ে আজি,
বহায় নেত্র-কমল হইতে অশ্রু-নীহাররাজি!
নহে আঁখিজল, শোণিত-তরল জল হ'য়ে যেন আসে,—
হৃদয়পিণ্ড খণ্ড খণ্ড, বুঝি বা বিরহ-গ্রাসে!

সহি' ঘোর ব্যথা সেই হেমলতা বাত্যা-তাড়িতা-হেন,
পড়িয়া ধূলায় কাতরে লুটায়,—চির-অসহায়া যেন!
অঙ্গদ হার কাঞ্চী বলয় মঞ্জীর নাসামণি—
একে একে সব ফেলি' আভরণ সখেদে কহেন ধনী,—

"সজনী, জীবনে কাজ নাই আর, কাজ নাই আভরণে
অনল জ্বালিয়া মরিব পুড়িয়া আজি এ বিজন বনে!
তোরা গালি দিস্, নহে তাহা বিষ—আশিস্ আমার কাছে!
উহা বিনা আর বিমূঢ়া রাধার প্রাপ্য কি-ই বা আছে!

দেগো, তোরা গালি, আর চিতা জ্বালি' পূর্ব্বপ্রণয় স্মরি';
এ দেহে কী কাজ' যারে ত্যজি' আজ গিয়াছে প্রাণের হরি।
আমার নিকট সদা সঙ্কট—সত্য, তোদের আলী!
সদা হাহাকার তোদের সোনার অঙ্গ করিছে কালি!

এই সেই দিন করি' মহামান, অষ্টাদশটি দিন
দিয়েছি যে ব্যথা, আজো সেই কথা মনেতে হয়নি লীন !
পুন সেই মান হ'ল প্লবমান বঁধুর সোহাগ পে'য়ে,—
জানিনা এবার হ'ব কিনা পার ভাঙ্গা এ তরণী বে'য়ে !

বঁধু কতরূপে আসি' চুপেচুপে সে'বার সেধেছে মোরে,—
সে আরতি ত'ার স্মরিলে আমার ভাসে বুক আঁখিলোরে !
সাজি' বিদেশিনী, আর বেসাতিনী করেছে মিনতি কত
নাপিতিনী হ'য়ে হয়েছে দাসীর চরণ-সেবায় রত ;—

বাঁধিয়া অলক, চরণে যাবক দিয়াছে যতন করে',
লিখে নিজ নাম এ চরণতলে ছিল সে বক্ষে ধরে !
আজো সেই নাম আছে অঙ্কিত দুষ্টার পদতলে,—
এই বহুমান লভি' পুন মান আসে কী আশার ছলে !—

হইয়া মালিনী দিল মালাখানি হাসিয়া কণ্ঠে তুলি',—
সেই সুধাহাসি,—চকোরী-পিয়াসী এখনো যায়নি ভুলি' !
সে মানের দায় মাখিয়াছে হায়, গায়েতে ভস্মরাশি,—
হেরি' সে ভিখারী, যায় নাই মরি' তার এ পাষাণী দাসী !

এমন পাপিনী—না দেখি না শুনি ত্রিলোকমাঝারে আর !
সুধু মাটি ছাই বহিয়া বেড়াই হ'য়ে ধরণীর ভার !
তোরা অপমান করিস্ আমায়,—ওযে ঔষধি মোর ;—
অপ্ দিয়ে যদি যায় মান ধু'য়ে আঁখিপথে বহি' লোর !

যথা অভিমান তথা অপমান—পাশাপাশি করে বাস,—
মাত্রা হারায়ে যাত্রা করিলে, আসে স্বধু তাহে ত্রাস।
বামা করি' মোরে বাম্যতা-ব্যাধি দিয়াছে নিদয় বিধি,
সেই ব্যাধিবশে বার বার খসে কৃষ্ণ-কণ্ঠ-নিধি।

দক্ষিণা যারা, সুভাগী তাহারা, সুখী তা'রা চিরকাল ;
নানা উপচায়ে পূজিয়া শ্রীধরে স্নিগ্ধ তাদের ভাল !
তোরা যেতে চাস্ চন্দ্রার পাশ, তাহে হব' আমি সুখী ;
অভাগীর সাথে দিবসে ও রাতে কেন বা হইবি দুখী !

যাগো, তোরা সেথা, আমি স'ব ব্যথা এ ভাঙ্গা হৃদয় ল'য়ে,
না হ'লে মরণ যাপিব জীবন চির-উদাসিনী হ'য়ে।
এলায়ে কবরী, শিরে জটা ধরি' কাননে করিব বাস,
খুলি' আভরণ, ভস্মলেপন করিব বারটি মাস ;

মৌনা হইয়া র'ব চিরদিন তাপসীর ব্রত ধরি',—
এ দেহ পতন হ'লে যদি পাই আন জনমেতে হরি !
সে বিনা আমার আর চাহিবার নাই কিছু বিধি-পাশে,—
র'বে চাতকিনী দিবস যামিনী শ্যাম-নবঘন আশে ;—

পড়িলে অশনি, বর বলি মানি' লইব শিরেতে ধরি' ;
নিব করকায় পাতিয়া মাথায় তা'র স্মৃতিসুখ স্মরি !"—
যত সঙ্গিনী শুনিয়া এ বাণী করে সবে, হায় হায়,—
দিয়া মুখে বাস ফেলে সবে শ্বাস, আশ্বাস নাহি পায়।—

গোপাঙ্গনার রাধা-প্রেম

নিত্যসিদ্ধা অপাপবিদ্ধা ব্রজের নাগরী যত
রাধা-রসাধারে কৃষ্ণ-মাধুরী পিয়ে ল'য়ে প্রেমব্রত !
ত্রিলোকমাঝারে এ মহান ভাব আর নাই কোনোখানে,—
রাধাদেহে ভোগ করিয়া কান্তে, থাকে রাধাগত প্রাণে !

এক, গোপী বিনা এ দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই ভবে,—
নিজ দেহস্মৃতি আনে না অনীতি এদের রসোৎসবে !
নায়ক নায়িকা মাঝারে অপরা নায়িকার নাহি স্থান,—
বিশ্বরাজ্যে ইহাই নিয়ম করেছেন ভগবান্ !

দেব কিন্নর, অসুর ও নর—সবে ইহা মানি' চলে,—
প্রতিদ্বন্দ্বী উদয় হইলে, আপনি ঈর্ষা জ্বলে !
দেহ-সম্ভোগে জনমে এ রোগ সবার হৃদয়ে আসি'—
প্রণয়েতে যদি উপজে এ ব্যাধি, দেয় সব সুখ নাশি'

এই রোগ হ'তে সুচিরমুক্তা রাধা-সহচরী সবে,—
যেহেতু স্বদেহবুদ্ধিবিহীনা তাহারাই এই ভবে !—
শ্রীরাধা-মাধব-মিলনোৎসুকা সে গোপীসমাজে আজি
পড়ে রাধাশ্রু-বরষাপ্লাবনে কঠোর করকারাজি !

করি ভর্ৎসনা অনুতাপ-তুনা, তাই নাহি সরে কথা,—
অনেক যতনে সংযত মনে কহে চম্পকলতা,—
"শুন, আদরিণী প্রাণস্বরূপিণী জগন্মোহিনী রাই,
তুমি বিনা আর ব্রজগোপিকার আপনার কেহ নাই !

দেহ ছাড়া প্রাণ থাকিতেও পারে, জল ছাড়া হ'য়ে মীন ;
কিন্তু আমরা তোমা-ছাড়া হ'য়ে বাঁচিব না একদিন।
বরং কৃষ্ণে করি পরিহার রহিবে ব্রজের বধূ,—
তবু সম্ভব নহে কভু ছাড়ে শ্রীরাধা-কমল-মধু।

যদি নাহি আসে কৃষ্ণ, ভাগ্যে হয় ঘোর দুখোদয়,—
সহিবে সে জ্বালা লয়ে ব্রজবালা, রাধার পদাশ্রয়।
যদি কোটি কানু, আসে হয়ে ভানু গোপিকা-পদ্মদলে,—
বাঁচাতে নারিবে, বিনা এ জীবনরূপিণী রাধিকা-জলে।

মৌখিক যাহা করিয়াছি, তাহা রাখিও না আর মনে ;
ও মলিন মুখ দেখি ফাটে বুক, হে চারুচন্দ্রাননে !
গুরু ত্যাগ করি ভজে গোবিন্দে, সে পাপী নরকে মজে,
তুমি প্রেম-গুরু, তোমায় ত্যজিবে এমন কে আছে ব্রজে।"

কহেন সুদেবী, "শুন, ব্রজদেবি, আমরা সাধিকা তব ;—
ছাড়ি দেবতায়, সাধক কি যায় খুঁজিতে বিভব-নব।
যাঁর করুণায় পেয়েছি কৃষ্ণে, তাঁরে যদি নাহি মানি ;
কৃতঘ্নতার পাতকে তবে যে হইবে বিষম হানি।

ব্রজের গোপিকা যুগল-সেবিকা, ভজে না কৃষ্ণে একা,—
তাহে হোক্ শুভ কিম্বা অশুভ— যা কিছু ললাট-লেখা।
করি রাধা ত্যাগ কৃষ্ণেতে রাগ—কুলটা ধর্ম্ম যাহা,—
সতীব্রতী এই ব্রজের যুবতী কখনো করে না তাহা।

চন্দ্রা কী ছার! শত চন্দ্রমা ঢালে যদি শীতলতা,
হবে না শীতল গোপিকাসকল ছাড়ি এ কল্পলতা।"
"তুমি আরাধনা, হরি আরাধ্য"—কহেন রঙ্গদেবী—
"ব্রজের কামিনী পায় বেণুপাণি, তোমারি চরণ সেবি।
আমরা ভোক্তা, ভোগ্য তোমরা—আধার আধেয় ভাবে;
রাধা-রসাধার ছাড়ি গোপিকার কাজ নাই রসলাভে॥"
সুচিরস্নিগ্ধা তুঙ্গবিদ্যা বলে, "শুন, রাধাপ্যারী,—
তুমি জীবনের জীবন মোদের, তোমারে ত্যজিতে পারি!
শত জ্বালা সই, তবু প্রাণসই, ওই মুখ-চেয়ে আছি,—
তোমার মাধুরী, যেন যাদুকরী, তারি মায়াবলে বাঁচি।"
"শ্যাম-সুধাসার, তুমি সে আধার"—কহে সখী বিশাখিকা,
"তৃষিতা চকোরী—মোরা ব্রজনারী, শুন, রাই প্রাণাধিকা।
উথলে যে সুখ হেরি চাঁদমুখ তাহে বুক ভরি যায়।
তিলেক বিরহ কত যে অসহ,—তাহা জানাইব কায়।
আমরা রসিকা, রসের বিয়োগ সহিতে না পারি কভু,
রসময়ী রাই-চন্দ্রমা বিনা, চাহি না চন্দ্রা-প্রভু।

পূর্ব্ব স্মৃতি

ব্যথাহতা রাই বলে, "নাই নাই সে রস এ চাঁদে আর,—
প্রভাতের শশী পড়িয়াছে খসি হয়ে আকাশের ভার।
বাম্যতা-রাহু দিয়া দুই বাহু নিঙাড়ি নিয়াছে রস,—
হয়ে দিনমান এসেছে যে মান, এরে কে করিবে বশ।

হেথা চাঁদ নাই, উড়ে ধূলি ছাই নিদাঘ-রবিরে ঘেরি,—
বহে ঘন ঘন তপ্ত পবন প্রখরা দিবারে হেরি।
তোরা পিপাসিতা, মোর আশ্রিতা হয়ে বা মরিবি কেন,
অখিল রসের সে মহাসিন্ধু নিকটে থাকিতে হেন।

বুঝি, মোর ভালে আর কোনোকালে হবে না সে রসোদয়,—
বাম্যতা-ব্যাধি দিয়া মোরে বিধি করিল নিরাশ্রয়।
বিশ্বের গুরু সে জীবনতরু,—জগৎ যাচিছে যারে,—
আমি অভাগিনী, তাহারে না চিনি এসেছি মরণ-দ্বারে।

হয়েছে আমার কণ্ঠলগ্ন নিয়তির কাল-অসি।
কণ্ঠের হার তাই রে, আমার বার বার পড়ে খসি।
কত প্রেমময় সেই সুখালয়, তাহা তো জানিস্ তোরা ;
এত উপেক্ষা সহিয়াও আসে নিজ প্রেমে হয়ে ভোরা।

কিন্তু এবার মোর ব্যবহার সীমা ছেড়ে গেছে চলি,—
এ দূষিত ফুলে আর কোনোকালে আসিবে না সেই অলি
নিজের উপরে বিশ্বাসহারা হয়েছি এবার আমি ;
আপনার পায়ে আপনি কুঠার দিয়ে কাঁদি দিনযামি।

ঘিরেছে আমায় অভিমানরূপ ঘোর দারিদ্র্য আসি,—
সে বাতাসে করি সব শুভ নাশ, আনিছে অশুভরাশি।
হরি-বর্জ্জিত হইয়া জীবিত যাহারে থাকিতে হয়,—
শত ধিক্কার জীবনে তাহার! সে কেন বাঁচিয়া রয়?—

সখি, পড়ে মনে শৈশবকাল জননীর স্নেহকোলে—
তন্দ্রায় সুখ-স্বপ্নের মত স্মৃতির মাঝারে দোলে।
বাল্যের খেলা—বালিকার মেলা বসিত ধূলায় সুখে,—
ছিল হাসি গান, ছিল খোলা প্রাণ, ছিল না কালিমা বুকে।

শশিকলাপ্রায় ভরিল অঙ্গ পৌগণ্ডেতে আসি,—
স্থিরতা আসিয়া করিল হরণ বালচাপল্যরাশি।
পড়ে মনে—সেই পৌগণ্ডের গণ্ডি ছাড়ায়ে যবে,
নব তারুণ্য জীবন-গগনে উদয় হইল সবে,—

এস সে নবীন, আমার অঙ্গে—নয়নে বক্ষে নামি,—
তরুণ প্রভাতে বালারুণসম তাহারে হেরিনু আমি।
নব বসন্তে মুকুলিত শাখে স্ফুটনোন্মুখ কলি,
চঞ্চরীকের চঞ্চলতায় যখনো পড়েনি ঢলি;

হৃদয়ে জেগেছে এক রতি মধু, নয়নে লেগেছে আলো—
আধেক বিকাশে উজল, আধেক গুণ্ঠনে ঘন কালো,
আলো ও ছায়ায় মাখা কৈশোর এসেছিল প্রাণে নামি,—
সেদিনের কথা,—এখনো, সজনী, ভুলিতে পারিনি আমি।

শীতে বসন্ত-আমেজের মত গোপনে হৃদয়ে এসে,
চেয়েছিল পূজা অজানা দেবতা অপরিচিতের বেশে,—
তোরা সেই কালে, যমুনার কূলে শুনালি বাঁশীর গান—
শুনি তা শ্রবণে, সুরাকর্ষণে উচাটিত হল প্রাণ।

চুম্বকসম মন টানি সুর, গেল জ্ঞান দেশে চলে,
হেনকালে শুনি 'কৃষ্ণ' এ নাম, প্রাণ গেল তাহে গলে।
আঁকিয়া চিত্র দেখাল চিত্রা, নয়ন মাতিল তাহে,
তিনে আসক্তি ত্রিধারায় টানি তরণী ডুবাতে চাহে।

নয়নে শ্রবণে চিত্তে আমার ঘটেছিল যেই চ্যুতি,
করি সমাবেশ তাহা হৃষীকেশে, দেখালি সহানুভূতি।
'স্খলন' না লিখি, লিখিয়া 'মিলন, অচ্যুত সনে', বিধি
করিল রক্ষা যক্ষের মত, মোর সতীত্ব-নিধি।

মনে পড়ে—সেই পূর্ব্বের রাগ, সেই রাধা-লাজশীলা,
বঁধুর বেদনা বন্দনা আদি নায়ক-উচিত লীলা।
মনে পড়ে মোর প্রথম মিলন-দিবসের সব কথা—
সে শ্যাম-তমালে জুড়াল যেদিন লজ্জাবতী এ লতা,

অভিসার-আশে নীপ-নিকুঞ্জে আমার চিন্তামণি
উৎকণ্ঠায় পথপানে চায় নিমেষে বর্ষ গণি।
আমারে লইয়া মিলাল বৃন্দা নন্দকুমার সনে,
সে মধুলগনে তা'র পরশন—এখনো জাগিছে মনে।

ধরিয়া চিবুক, লাজনত মুখ সোহাগে নিল সে বুকে,
ঘন পল্লবে সলাজ নয়ন মুদিয়া পড়িল সুখে।
তাড়িতপ্রবাহ সকল অঙ্গে হল প্রবাহিত মোর,
"সেই সুখস্মৃতি" বলিয়া, শ্রীমতী বহায় লোচন-লোর।

ভাবসংযত করি বলে রাই, "নিখিল বিশ্বমাঝ,
রূপের সাগর গুণের আগর সে শ্যাম-নাগররাজ।
অনুপম তা'র সকল অঙ্গ, ব্যঙ্গ, রঙ্গ, হাসি,
অনুপম তা'র ভালবাসা, ভাষা, আশা আকাঙ্খারাশি ;

অনুপম তা'র নয়নযুগল—মদন-বিজয়ী-বাঁকা,
বান্ধুলিফুল-অধর-অতুল, অমৃত দিয়া মাখা ;—
নয়নাভিরাম বঙ্কিম ঠাম।—প্রাণারাম নামগুলি,—
ভাবিলে চিত্ত হয় সমাহিত, বলিলে জগৎ ভুলি।—

তারপর তা'র সঙ্গে হইত দেখাদেখি কত ছলে,—
নীল যমুনার জলে গিয়া নীল নয়ন ভরিত জলে।
সেই হ'তে কভু রোষ সন্তোষ, মান অভিমান মাঝে,
কভু অভিসার-চিন্তায়, কভু অকাজে, কখনো কাজে,

চিরসম্বল মোর আঁখিজল নয়নে নিয়েছে বাসা,—
সুখেও উথলে, দুখেও উছলে, জানি না ল'য়ে কী আশা!
হারাই হারাই এ ভয় সদাই আছে মোর প্রাণে জাগি'—
অভাগী রাধার পদে পদে বাধা, হ'ল না সে সুখভাগি।

কলহংসীর মত সে বংশী যেতো কলনাদ করি'
কাননে কুঞ্জে কত সঙ্কেত-বারতা বুকেতে ধরি,—
কত ব্যাকুলতা আসিত বাঁশীর সুরের স্বরূপ ল'য়ে,
যেত' অভিসার-নিশার সময়, কানন, কুঞ্জ ক'য়ে।—

গৃহে অলিন্দে কত ছলে নাথ দিয়ে যেত' পদরেণু,—
কভু পিপাসার ছল করি', আর কভু বা খুঁজিতে ধেনু।
অঞ্চলে মোর দিত ফুলরাশি হাসি' হাসি' মনচোর,
বাঁশী যেত' খসে', না জানি' যেত সে আবেশে হইয়া ভোর।

বেণু-সন্ধানে পাঠাত' বন্ধু, 'কক্ষটী' বানরীরে।
ল'য়ে যেত' হরি' সে চোর বানরী মোর গৃহে আসি' ধীরে।
কভু নবনীত হরিতে কান্ত জটিলার গৃহে আসি'
সুপ্তা-ননদী-বদনেতে দধি লেপিয়া পলাত হাসি।

নিরালা পাইলে, আসি কৌশলে লইত আমায় কোলে;
কত ছল করি' আসিত শ্রীহরি আমায় দেখিবে বলে'।
কত হিঁদোলায় দোলাত দোলায়, ফাগুনে খেলিত হোরী,—
কত অনুরাগে চুমিয়া সোহাগে, বলিত, 'হে মোর গোরী।

হোলীতে হারিয়া হইত বন্দী মন্দিরে আসি মোর;
তুফানে তরণী ফেলিয়া গোপীর বহাত' আঁখির লোর।—
জয় পরাজয় নিত্য তাহার খেলায় আসে গো, ভেসে,—
কখন কাঁদায়, কভু কেঁদে যায় কানন-কুঞ্জে এসে।—

তা'র প্রেম-খেলা, মধুময়ী মেলা কভু কি ভুলিতে পারি।
সে মাধুরী হেরে ধৈরজ ধরে, কে আছে এমন নারী।
মনে পড়ে, সেই দিবা-অভিসার, সেই দানকেলি-কথা,
সে বাক্‌চাতুরী—প্রাণমন-চুরি, সেই সুখ সেই ব্যথা;

সে চপল দিঠি, হাসি-মিঠিমিঠি, ব্যঙ্গ-রঙ্গরাশি,
সে যমুনাতীর—ব্রজযুবতীর কুলনাশা সেই বাঁশী।
তা'র সখা সাথী আছে সুখে মাতি' দিবারাতি কাছে থাকি',
আমি চাতকিনী, বর্ষারূপিণী ঘোরা রজনীরে ডাকি।

গোষ্ঠের বেলা, থাকি দুই বেলা প্রাসাদ শিখরে বসি',
কভু গবাক্ষে অক্ষি রাখিয়া দেখি তা'র মুখশশী ;
গোধূলির ধূলি মাখা সারাগায়, অলকে শ্রীমুখ ঢাকা,
ফাঁকে ফাঁকে যেন দেখা দেয় চাঁদ সজল জলদে আঁকা।

উতলা জননী, ধায় বেণুপাণি—জাগে সেই ছবি মনে,
চৌদিকে ঘেরা সফেন জলধিসমান সুরভিগণে
উঠে তরঙ্গ, করে সুরঙ্গ বালক-সঙ্গীসবে,
পুরবাসী আসি' দেখি' শোভারাশি অতুলিত সুখ লভে।

শত ধিক্কার নারীর জীবনে! অবরোধে পড়ে আছি,
কূপমণ্ডুক-জনম লভিয়া গণ্ডুষ জলে বাঁচি।
কৃষ্ণসঙ্গ দিল না নিদয় বিধাতা অবলা বলি।
করি ব্রতাচার পুরুষ-আকার ধরিব আসিলে কলি।

সখি, সেই দিন পড়িতেছে মনে— যখন বঁধুর সনে
ভূজে ভূজলতা বাঁধিয়া নিশায় ভ্রমিতাম বনে বনে,
মলয়সমীর ঢালিয়া সুরভি লুটাত আঁচল ঘেরি,
দিগ্‌বধূগণ বরষিত ফুল চাঁদমুখ হেরি হেরি,

যদি অপাঙ্গে চাহেন মাধব, এই আশা লয়ে বুকে,
দীঘল নয়ন তুলি মৃগগণ সঙ্গে বুলিত সুখে ;
নব মল্লিকা মালতী মাধবী হাসিত ফুটিয়া গাছে ;
ময়ূর ময়ূরী নাচিত আসিয়া দোঁহার আগে ও পাছে।

আমার শারিকা তার শুক সনে করিত দ্বন্দ্ব কত,
সে প্রেম-কলহে প্রখরা শারিকা শুকেরে করিত নত।
তার মৃগ সনে আমার হরিণীগণের মিলন করি',
মোর বয়স্যা লয়ে রহস্য করিত রসিক হরি।

আমার মরালী তাহার মরাল খেলিত সরসী-জলে,
আমার সারসী তাহার সারসে ছিল প্রেম গলে গলে।
দোঁহার কপোত-কপোতীসকল আসিয়া দোঁহার পাশে,
উড়িয়া উড়িয়া বেড়িয়া দোঁহায় বুলিত আহার আশে।

যখন বিমল পূর্ণিমা রাতে কুসুমশয্যাপরে
শুইতেন হরি মোরে বুকে ধরি বিপুল সোহাগভরে ;
শারদ জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িত শ্যামল অঙ্গ বেয়ে,
সে শ্যাম শোভায় শ্বেত জ্যোছনায় শ্যামতা বাইত ছেয়ে।

কৃষ্ণের কামে জাগে অনুরাগ, নাই কালো দাগ তাহে,
ভাবের পিয়াসী নানা ছলে আসি শুধু ভাবটুকু চাহে।
আমি ত জানি না কিভাবে ভজনা করিতে হয় সে হরি,
শুধু তাঁরে স্মরে' থাকি প্রাণ ধরে', নতুবা জীবনে মরি।

তা'র বেণুনাদে করে উন্মাদ, শিথিল করে গো দেহ,
নীবী যায় খসে রাতে ও দিবসে, কি হেতু জানে না কেহ।
রন্ধনশালে আঁখি ভরে জলে,—দেখি সেই দশা মোর,
বক্রনয়নে নিদয়া ননদী বলে "একি দশা তোর ?"

করি কৌশল ইন্ধনে জল দিতে হয় ধূম লাগি।
হায়, পরাধীন নারীর জীবন শুধু কি দুখের ভাগী।
সতিনী হইতে ননদীর জ্বালা আরো শতগুণ জ্বলে;
করি কত ছলা বেড়ায় কুটিলা লাগিয়া আমার গলে।
ভ্রাতায় লইয়া কাননে কুঞ্জে ভ্রমে সে কলহ তরে;
সে চক্রান্ত করেন কান্ত ছিন্ন পলকভরে।
কালী হ'য়ে কালা দিয়েছিল কালি কুটিলার কালো মুখে,
ভঞ্জন করি মোর কলঙ্ক জ্বালে জ্বালা তার বুকে।

এইরূপ তার করুণা অপার এখনো মনেতে জাগে,
দাতা হয়ে দান করি পুন কান, দীন হয়ে দয়া মাগে।
এত গুণপনা বুঝেও বুঝি না, এমনি কঠোরা আমি,
যত পাই, চাই,—শেষ বুঝি নাই এ তৃষার দিনযামি।
সে জগজীবন, জগতের জন কেন না যাচিবে তা'রে,
আমি একা তা'র সে শুধু আমার, একি কভু হতে পারে।
আজি অপরাধ করেছে গো, রাধা জগদাধারের কাছে,
তাই অশুভের বার্তা বহিয়া দক্ষিণ আঁখি নাচে।

বলাই সাজিয়া করেছে নিন্দা রাধা প্রিয়জনে তা'র,
সেই কথা স্মরি সে প্রেমিক হরি হেথা না আসিবে আর।
শত কৈরব আছে চন্দ্রের, কুমুদীর শশী একা,
তারে অপমান করিয়া ভাগ্যে দুর্গতি দিল দেখা।

নিজের বিপদ ডেকেছি নিজেই বলাই সাজিয়া আমি,
পুন করে মান করি অপমান না চিনি জগৎস্বামী।
হায়, সেই পাপ দিতেছে গো, তাপ সবলে গর্ব্ব দলি',
ভবার্ণবেতে ফেলিয়া তরণী নাবিক গিয়াছে চলি।

অভিমান আসি দেয় বোধ নাশি গ্রাসিয়া রাহুর মত,
সব ভুলে তাই তাহারে কাঁদাই ত্যজিয়া সতীর ব্রত।
তাই গত কথা হতেছে স্মরণ মরণ নিকটে দেখে',
যাহা প্রতি পলে এ হৃদয়তলে গোপনে গেছে সে এঁকে।

সব আছে মনে, আজ ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ হতেছে তাহা,
সে অধর, সেই নাসিকা চিবুক, গণ্ড ভ্রূলতা আহা!
সে চপল আঁখি গিয়াছে গো, বাঁকি তরল চাহনি লয়ে
শ্রুতির নিকট করিতে সখ্য অশ্রুত বাণী কয়ে।
করিলে স্মরণ হয় স্মরার্ত্ত ললনা-চিত্ত যাহে,
সেই সুবলিত ভুজ-আশ্রয় কোন্ নারী নাহি চাহে।
কোটি-সিতাংশু-শীতল বক্ষ লক্ষ্মীর ক্রীড়া-ভূমি ;
শ্রীপদ-কমল কমলা-অলিনী নিশিদিন রয় চুমি।

রমা-দুর্লভ প্রেম দিয়া বঁধু বেসেছিল মোরে ভালো—
অনাদর করে নিভায়েছি আমি আজি সে প্রাণের আলো।
"হায়, কেন আছে জীবন"—বলিয়া রাধিকা প'ড়ল ঢলি ;
যেন যূথপতি গেল গো, পদ্ম-কানন চরণে দলি।

মূরছি প'ড়িল ব্রজের কমল অতীত স্মৃতির ঘায়ে,
আশ্রয়চ্যুতা যেন হেমলতা অতি অকরুণ বায়ে।
বিশাখার কোলে বিশাখা লতিকা—বিশ্বললামভূতা
শ্যাম-তরু-চ্যুতা ধূলিলুণ্ঠিতা বৃষভানুরাজসুতা।

অবনী উপরে বেণী লুটাইছে মণিহারা ফণী-প্রায়,
কৃষ্ণ-চন্দ্রে না দেখি নয়ন-কুমুদী মুদেছে হায় ;
সে চারু অধর হয়েছে নিথর মধুর আলাপ ত্যজি',
সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্যাম-সুধারসে বুঝি বা গিয়েছে মজি।

তাই শ্রুতি নাসা, মন আঁখি ভাষা—সব, শ্যাম-রসায়নে
মিলি একত্র লভি একত্ব ভুলেছে বিশ্লেষণে।
ব্যাথাহত কবি দেখি এই ছবি ফেলিছে আঁখির জল
'পঠমঞ্জরী' আসিয়া বাণীর চুমিল চরণতল।

শ্রীনাম-জয়ন্তী

যে সমাধিযোগে শ্রীরাধিকা জাগে, তথা নাহি জাগে কেহ
ধ্যানের মাঝারে ডুবিয়াছে ধ্যাতা ভুলিয়া দেহের স্নেহ।
শুধু শ্যামময় অনুভবে লয় হয়েছে চেতনা তাঁর,
সেথা শ্যাম বিনা রাই আছে কিনা, এ জ্ঞান আছে বা কার!

দীর্ঘশ্বাস ফেলি 'মঞ্জরী' মৃদুগুঞ্জনে কাঁদে,
বিয়োগ-দুঃখে আনত নয়ন, বাঁকায়ে বদন-চাঁদে।
'মালবী' কাঁদিছে অদূরে দাঁড়ায়ে ধূলায় লুটিতাদেহা;
রক্তবসনা 'পাহাড়ী' কাঁদে শ্রীনন্দনগিরিগেহা।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাগ ও রাগিনী করুণ কাহিনী গায়।
দশম দশায় প্যারী মূর্চ্ছিতা,—সবে করে, হায় হায়!
সঙ্গিনীগণ করিয়া রোদন করে করাঘাত শিরে,
কেহ করে মুখে জলসিঞ্চন কেহ বা ব্যজনে ধীরে।

এক সুচতুরা আভীরকুমারী শ্রীমতীর পাশে বসি
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ডাকে, আর বলে, "কোথা, গোকুলের শশী।"
এস একবার, নিঠুর কান্ত, কান্ত-কান্তিশালী।
তব কান্তার অন্তিম দশা হের, হে, গুঞ্জামালী।

এস, প্রাণারাম সুন্দর শ্যাম, রাধার হৃদয়নিধি।
এস, গোপিকার জীবন-আধার, প্রেম-সাধনার সিধি।
নয়নানন্দ গোকুলচন্দ, মন্দ-মধুর হাসি
সুধাসিঞ্চনে কর সচেতন চকোরী-রাধায় আসি।

তোমার বিরহ-মরুতে পড়িয়া কান্তা মরিছে তব—
দেখাও, দয়িত, মরু-উদ্যানসম রূপ-অভিনব।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে সখীগণ শ্রীরাধার কাছে বসি—
পাতালে বাসুকি শুনে সেই নাম, গগনে রবি ও শশী।

'কৃষ্ণ' নামেতে কর্ষিত হ'ল উদ্গতপ্রাণা রাধা
উঘারি নেত্র কহে, "কৃষ কৃষ" জড়িত শব্দ-আধা।
কহে, "সহচরী, কি নাম শুনালি, কই কৃষ, কই কই?
আমি তো জানিনে এ-তিন ভুবনে 'কৃষ্ণ' এ নাম বই।

আহা কি মধুর 'কৃষ্ণ' বলিতে রসনা নৃত্য করে,
কোটি জিহ্বায় জপিলে সে নাম তবু সাধ নাহি পূরে।
যবে শুনি কানে কৃষ্ণের নাম, অর্ব্বুদ কান লাগি
ডাকি বিধাতায়, নমি তাঁর পায় ওই বরদান মাগি।

কৃষ্ণের স্মৃতি জাগিলে চিত্তে বিস্তৃত হয় বুক,
ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরে না, সজনী, এত সুখ, এত সুখ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় চিত্তরূপেতে হোক পরিণত মোর
"কত সুধাঢালা এ দুই আখর' বলি ঝরে আঁখিলোর।

নামের প্রভাবে প্রাণ ফিরিয়াছে বৃষভানুসুতা-দেহে
বাণী-বীণা ছাড়ি গিয়াছে 'পাহাড়ী' নন্দনগিরিগেহে।
সুরসংযোগে প্লাবিয়া বিশ্ব ঝরিল নামের ধারা,
সে নাম-আসবে মাতি 'ভৈরব' হইল আত্মহারা;

বাণীর বীণায় ভাসিয়া বেড়ায় নামের মহিমা গেয়ে,
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি 'ভৈরব' ভুবন ফেলিল ছেয়ে।
ত্রিদিব হইতে শুনে দেবগণ, পাতালে বাসুকি শুনে;
দশ দিক্‌পাল হইল মাতাল শ্রীনাম-মদিরা-গুণে।

ভারতবর্ষে প্রসূন বর্ষে যত-সব সুরবালা ;
ভারতীর পাশে আসি উল্লাসে দাঁড়াইল রাগমালা।
বার্ত্তাবাহিনী করি বীণাপাণি পাঠাল রাগিনীগণে
দেশে দেশে, তট তটিনী সিন্ধু, গিরি কান্তার বনে—

"শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা-অভিনব, অভিনব নাম-সুধা
বিলাও মর্ত্তে—পীড়িতে আর্ত্তে নাশিয়া মৃত্যু ক্ষুধা।"
বাণীর আদেশে নানা দিগ্‌দেশে রাগিনীসকল চলে,
নামের পতাকা লইয়া প্রেমের কাহিনী সবারে বলে।

যায় 'কর্ণাটী' কর্ণাটদেশে, 'গুর্জ্জরী' গুজ্‌রাটে,
যন্ত্রণা ভুলি মালবে 'মালবী' যন্ত্রের তালে হাঁটে ;
গৌড়ে 'গৌড়' সারেং সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া চলে,
সিন্ধে চলিল 'সিন্ধুড়া' ত্যজি লবণসিন্ধু-জলে ;

যায় 'খাম্বাজ' পল্লীর মাঝ, 'ছায়ানট' যায় বাটে ;
যায় 'বাগেশ্রী' 'মালকোষ' 'দেশ' কড়ি ও কোমল ঠাটে।
স্থলে চলে যায়, গগনে গড়ায়, জলপথে করে গতি,
সুরের বন্যা পাইয়া ধন্যা হইলেন বসুমতী।

সুরজ ঘেরিয়া গলি সুরগণ ঝরিল সুরের পারা,
কেহ শ্বেত কেহ নীল পীত, আর কেহ বা লোহিত ধারা।
সৌরজগতে জড় জঙ্গম সে আলো পরশ করি,
কৃষ্ণনামের আলিম্পনায় তখনি উঠিল ভরি।

গুঞ্জরি উঠি ভ্রমরী ভ্রমর, মুঞ্জরি উঠে তরু,
শ্যামল ছায়ায় জুড়াল ত্বরায় জীবের জীবন-মরু ;
কুহরে কোকিল, শিহরে নিখিলবিশ্ব সুখের ভরে,
অমৃতবাণী শুনায় রাগিনী মৃত্যুপীড়িত নরে।

সুরের আলোকসম্পাতে পাখী কলনাদ করে গাছে,
ফুটে ফুলকলি, পাখে নামাবলী মেলি শিখণ্ডী নাচে ;
আতস কাচের মতন কবির হৃদয়-ফলকে আসি
পড়ে বিচিত্র লীলার চিত্র রশ্মিপ্লাবনে ভাসি ;

হৃদয়-আতসকাচের কেন্দ্রে হইল একত্রিত
উজ্জ্বলরস-কিরণোজ্জ্বল ব্রজ-রহস্য-গীত।
ইন্দ্রধনুর বর্ণে বর্ণে গেল প্রাণখানি ছেয়ে,
উঠিল আবেগে কবির কণ্ঠ নান-প্রসঙ্গ গেয়ে,

"মুঞ্চ মুঞ্চ মান-অনিদান, অয়ি, প্রিয়ে চারুশীলে,"
বলি আসি হরি হৃদয়াঙ্গনে হ্লাদিনীর সহ মিলে।
কাঁপিয়া উঠিল কবির অঙ্গ বিপুল পুলকভরে,
হৃদয়-সিন্ধু উথলি অশ্রু অক্ষিপথেতে ঝরে।
কলহত জীব হইবে ধন্য ব্রজ-মাধুর্য্য লভি—
গীত-গোবিন্দে তাহার সূচনা করেন মধুপ-কবি।
লীলা-পঙ্কজে সঞ্চীকৃত রসসার-ব্রজবাণী
গীতগোবিন্দ-মধুচক্রেতে অবিরাম রাখে আনি,

সে মধুচক্র এমনি বক্র গড়িল চতুর অলি,
সন্ধানী বিনা সন্ধান তার পাবে না অন্ধ কলি।
অনাস্বাদিত সে মধু-গন্ধ পশিল গোলোকে গিয়া,
প্রেমের ভিখারী রাধা-ভাব ধরি ধায় পরিকর নিয়া।

কৃষ্ণান্বেষণ

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি কমলিনী ভাসে নয়নের জলে,
শ্রীমতী রাধায় সান্ত্বনা দিয়া ললিতা সহেলী বলে,
"সখি, এই দশা দেখিয়া তোমার, দেহেতে রহে না প্রাণ।
আমরা সাধিকা, তুমি যে সিদ্ধি—কৃষ্ণলাভের স্থান।
উঠ, মুখ তোল, ধৈরজ ধর, কৃষ্ণ-অন্বেষণে
যাবে, ঈশ্বরী, তব কিঙ্করী এখনি ব্রজের বনে।
ভুবনমোহনে খুঁজিব আমরা সকল ভুবনে বুলি,
পেলেই আনিব যত্নে রাখিয়া তব মর্য্যাদাগুলি।

সেই মানাবেশে থাক তুমি বসে, মহিমান্বিতা রাধা।
আবার আসিয়া সাধিয়া নাগর চরণে পড়িবে বাঁধা।
কোরো না শিথিল মানের রজ্জু ব্যাকুল হইয়া কভু
আমাদের রাধা নহে কিঙ্করী, সদা সে শ্যামের প্রভু।
দাস্যের ভাব আসিলে চিত্তে, দিও তাহা দূর করে',
হইয়া লোলুপ দেখো না সে রূপ, থাকিও মানের ভরে।
রাধিকার মান-মর্য্যাদা মোরা রাখিব জীবন দিয়া,
তাহে যত দুখ আসুক সহিব বিছায়ে সকল হিয়া।

মান-পণ্ডিতা ললিতা রাধায় দিয়া সান্ত্বনাবাণী
নাগিনীর মত নাগরে আনিতে চলিল দুলায়ে পাণি।
ভরা ভাদরের মত যৌবন ভরিয়াছে কূলে কূলে,
রাই-দুখে দুখী, যায় বিধুমুখী, পৃথু নিতম্ব দুলে;

বাঁকা ভুরু সহ বিশাল নয়ন বাঁকিয়া পড়েছে ঢুলে',
যুগ খঞ্জনা নাচিছে যেন গো, বদন-পদ্মফুলে।
চঞ্চল হয়ে বুলিছে দৃষ্টি দৃক্-অঞ্চল মাঝে,
যেন সলিলেতে দেখেছে সফরী নাসিকা-ক্রৌঞ্চরাজে।

বক্ষ-উপরে কুচ-দাড়িম্ব ফাটিয়া পড়িবে বলে',
শুকে বঞ্চিয়া রেখেছে মালিনী কঞ্চুলিকার তলে।
করে পূজারিণী পূজা অর্চ্চনা যৌবনশ্রীরে আমি,
স্বর্ণদেউলে বসায়ে জ্বেলেছে সোনার প্রদীপখানি।

কণ্ঠে কলিত মুক্তার মালা নেমেছে বক্ষ বাহি,
যেন চৌদিকে নির্ঝর ঝরে রূপ-লাবণ্যে চাহি।
ললিত-কপোলা সে ললিতা বালা, ললিত-বিলোল-হাসা,
ললিত নয়ন, ললিত বদন, ললিত শ্রুতি ও নাসা।

লম্বিত বেণী, মল্লিকাশ্রেণী ঘন-নিবদ্ধ তাহে;
হৃষ্টা ফণিনী পৃষ্ঠে দুলিয়া চরণ চুমিতে চাহে।
করে ঝলমল বিজয়োজ্জ্বল অশোকবরণ সাড়ী,
পুষ্পধনুর ইষুধি হইতে অশোক লয়েছে কাড়ি।

রক্তোৎপল নেছে পদতল, অরবিন্দরে আঁখি,
হাস্য নিয়েছে মল্লিকা, শুধু চূতমঞ্জরী বাকি ;
সেই শরে মার করে সন্ধান আসি বসন্তদিনে ;
ব্রজাঙ্গনার নিকটে মদন আসে না সহায় বিনে।

চূতমঞ্জরী-প্রহারে গোপিকা অচ্যুত-মতি জানি,
দূরে দাঁড়াইয়া রহে মনোভব জুড়িয়া যুগ্মপাণি।
মদনের মদে মর্দ্দিত করি চলিল ললিতা দেবী,
মন্থর পদে কলমঞ্জীর গুঞ্জরে পদ সেবি।

হইয়া বিলোল কুণ্ডল দুলে গণ্ডযুগল চুমি,
কাঞ্চী-কেয়ূর-শিঞ্জনে উঠে মুঞ্জরি বনভূমি ;
রাধা-মাধবের স্মরণ-সুখেতে নাচিয়া উঠিছে বুক,
উথলে সিন্ধু দেখিলে যেমন পূর্ণ চাঁদের মুখ।

শ্যামল বনানী, যায় একাকিনী রূপসী ললিতা-আলী,
তরু ও লতায় জিজ্ঞাসি যায়, "কোথায় সে বনমালী ?"
বকুলকাননে, ঘন নীপবনে, তমাল-পিয়ালবনে,
মাধবীকুঞ্জে, মালতীকুঞ্জে খুঁজিয়া ব্যাকুল মনে

জিজ্ঞাসে কথা, "শ্যাম আছে কোথা, তারে কি দেখেছ কেহ ?
কোন্ পথে গেলে পাইব কৃষ্ণে ?—সে পথ দেখায়ে দেহ।
কুঞ্জবিহারী কোন্ নিকুঞ্জে, কহ, নিকুঞ্জরাজি ?"
জিজ্ঞাসি ঘন বন উপবনে চলেছে ললিতা আজি।

বংশীবটে ও যমুনার তটে, বাটে বাটে খোঁজে বালা,
"কোথায় মুরলীমোহন কোথায় কুঞ্জবিহারী কালা ?"
বনস্পতিরে জিজ্ঞাসে অতি বিনয় করিয়া বামা,
"হে, দূরদর্শী, দেখেছ কি গোপকিশোর-'কৃষ্ণ' নামা ?"

আম্রকাননে সাশ্রুলোচনে প্রবেশিল বামা আসি,
জিজ্ঞাসে ডাকি—"জান কি, জান কি, হে, রসাল-সুখরাশি,
কোথা রসময় আছে এ সময়—কোন্ রসময়ীসনে
করিছে বিহার ?—অথবা রাধার বিরহ জেগেছে মনে ?

শ্রীরাধার কথা স্মরিয়া কি ব্যথা অনুভব করে হরি,
অথবা দ্বিরেক চুমিছে চন্দ্রমল্লী-চিবুক ধরি ?
মঞ্জরীধ্বজ হে, প্রিয় রসাল ! মাধবীর প্রাণ তুমি,
নব-কিশলয়-মালিকা-কণ্ঠে ভূষিছ কাননভূমি।

তুমি তরুরাজ, আসি ঋতুরাজ তোমার শাখায় দোলে ;
তোমার চরণে আসি মীনকেতু চূতমঞ্জরী তোলে।
ফলের জন্য জগতে ধন্য—অতি বদান্য তুমি,
কোকিল কোকিলা ফিরে দুই বেলা তোমার মুকুল চুমি।

সুরসাল ফলে তুষ্ট সকলে, মুকুলে কোকিল সুখী ;
আসে তব তলে কত দলে দলে চাঁদমুখ চাঁদমুখী।
তব পাখীগণ করে বিচরণ উড়ি উড়ি নভোপথে,
ভ্রমর ভ্রমরী আসে গুঞ্জরি নানা দিগ্‌দেশ হতে ;

আছে নানা দূত, অতি অদ্ভুত কর্ম্ম তাদের জানি—
জিজ্ঞাস সবে, "কোথা আছে এবে সুন্দর বেণুপাণি—"
হেনকালে ডাকে কৃষ্ণ কোকিল "কুহু কুহু কুহু" স্বরে'
উড়িয়া অদূরে বসিল বেতস-কানন-কুঞ্জপ'রে ;

যেন সঙ্কেত করিল বালায়—'কালাচাঁদ আছে হেথা,
আর বনে বনে করিয়া ভ্রমণ চরণে পেয়ো না ব্যথা।
দেখি সন্দেহে চাহে মনোরমা বাঁকায়ে বদনখানি,
বেতস কানন দেখি ভাবে, হেথা কেন যাবে বেণুপাণি।

পুন ভাবে, বুঝি লকুটির লাগি গিয়াছে সখার সনে—
ভাবি চলে বালা লাঞ্ছিত করি মত্তা মরালীগণে,—
অলিনী চলিল কৃষ্ণ-কমল-বদন-দরশ-আশে,
নাশিল তাহার সব সন্দেহ মোহন অঙ্গ-বাসে!

কিছু দূর গিয়া, থমকিয়া বালা ভাবিল কি-যেন কথা,—
মুখে খেলে' যায় বিপুল শোভায় হাস্য-বিজলিলতা।
মন্থর গতি আরো মন্থর হয়েছে কাননে ঘুরি,
মুখ-ইন্দুতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরে যেন ফুলঝুরি।

মুছি' স্বেদজল ভূষণসকল সংযত করে বালা ;
ভূষণের ধ্বনি কিছুতেই যেন শুনিতে না পায় 'কালা'!
চাহি' ইতি-উতি পশিল যুবতী গোপনে কাননমাঝে,—
দেখিল অদূরে মুদিতনেত্রে আসীন বিশ্বরাজে।—

শ্রীকৃষ্ণে কাম

কৌতুকে আলী আত্মগোপন করিল অন্তরালে—
হয়েছে নিবিড় বন্যলতিকা যেখানে গাছের ডালে
দেখে, ভূমিতলে যুগল চরণ-চিহ্ন আঁকিয়া, কানু,
'রাধা'নাম তা'র উপরে লিখিয়া পাতিয়াছে যুগজানু ;

মাথার উপর যুড়ি' দুই কর মুদিয়া কমল-আঁখি,
"রাধা রাধা" নাম রটে অবিরাম যেন সুধারস চাখি—
নয়নের নীর গলি অবনীর শুকতা দেছে নাশি ;
আজি উপাস্য উপাসিকা ত্যাগ হয়েছে কাননবাসী।

আজি এ দৃশ্য দেখায়ে বিশ্বে বলে যেন এই কথা,
'আমারে স্মরিলে তারে স্মরি আমি লয়ে এই ব্যাকুলতা।
আরাধিকা রাধা, তার প্রেমে বাঁধা পড়েছে প্রেমিক হরি;
করে আরাধনা হয়ে আরাধ্য আরাধিকা-প্রেম স্মরি।

ক্ষুদ্র বৃহৎ, মূঢ় বা মহৎ—যে জন তাহারে ডাকে,
বিশ্বের ভূপ ভাব-অনুরূপ রূপে তার কাছে থাকে।
এক রতি স্নেহ দেয় যদি কেহ, মেরুসম হরি গণে ;
কৃতজ্ঞতায় কে হবে তুলিত দয়ার পাথার সনে।

ধনী দরিদ্র করে না বিচার, চণ্ডালে বলে "মিতা",
পাদুকা বহন করে প্রেমে গলি গোয়ালায় বলি "পিতা" ;
মালীকন্যার পাছে পাছে ধায় গীত-গোবিন্দ শুনি,
চামারের কাছে আসি প্রেম যাচে করুণার জাল বুনি।

দীন হয়ে যদি ডাকে দীননাথে, তবে সে দয়াল হরি
লক্ষ্মীর সেবা ছাড়ি ধায়, হায়, কৌপীন সার করি,
দ্বারে দ্বারে যায় লুটায় ধূলায় "এসেছি এসেছি" বলে,
ধূলিলুণ্ঠিত দীন সন্তানে আদরে ধরে সে কোলে।

ধ্রুব প্রহ্লাদে করিল করুণা, সে নহে অধিক কথা;
সর্ব্ব অংশে শ্রেষ্ঠ তাঁহারা—ছিল না অযোগ্যতা।
গুহক, শবরী, দেবী-অহল্যা আদি মহাজনগণে
করেছে করুণা; কিন্তু ছিল না তখনো ভরসা মনে।

জগাই-মাধাই উদ্ধারি হরি কলি-জীবে দিল আশা,
থাকিবে না বাকী কোনই পাতকী, পাবে পদতলে বাসা
সে প্রেমিক হরি ব্রজাঙ্গনার মহাপ্রেমে পড়ে বাঁধা,
অঋণী হবার উপায় না দেখে কেঁদে বলে, "রাধা রাধা"।

বৃন্দাবনের সকামা গোপিকা এই কামতরু ধরি
পাইয়াছে যাহা, অকামীরা তাহা পায়নি যতন করি।
পঞ্চম রসে দিল শ্রেষ্ঠতা ব্রজের গোপিকাসবে;
কামোৎকর্ষে এ চরম ফল আর কে পেয়েছে কবে।

ব্রজের যুবতী চরম সুগতি পেয়েছে কৃষ্ণে লভি;
প্রাকৃত কামে হয়নি মলিন প্রেমের মোহন ছবি।
সে নিরঞ্জনে নাই অঞ্জন, নাই আকাঙ্খা আশা;
তবু ভক্তের বাঞ্ছা পূরাতে চায় সুধু ভালবাসা।

ভালবাসা যদি পায় এক রতি, তাহা "বন্ধু বন্ধু" বলে,
পাছে পাছে ধায়, চরণে লুটায় দাসের প্রেমেতে গলে।
ভাব-অনুরূপ ভোগ দেয় সবে, পিতা পতি সুত হয়ে,
ভাবের ভিখারী সে দয়াল হরি থাকে না অভাব সয়ে।

এক রতি স্নেহ দিলে দেয় দেহ, কেহ কি এমন আছে ?
তাই গোপিকার হয়ে আপনার ইঙ্গিত পেলে নাচে।
সেই মহাভাব ক্ষুদ্র নরের ধারণা-অতীত বলে,
"কামুক কৃষ্ণ" বলি অজীর্ণ উদ্গার তারা তোলে।

প্রাকৃত নর আছে বিস্তর প্রেম-মহাব্রতধারী,
তাদের প্রকৃতি অনীতির বশে হয় না স্বেচ্ছাচারী।
প্রেমপাত্রের মর্য্যাদা তারা রাখে প্রাণ মন দিয়া ;
প্রিয় বস্তুর ক্ষুণ্ণতা কভু সহে না প্রেমিক-হিয়া।

সুন্দর ফুল শোভায় অতুল, থাকিলে গাছের ডালে,
কুসুমপ্রেমিক ছিন্ন তাহারে করে না কোনোই কালে।
দেবপ্রতিমার প্রেমিক সে ফুল দেয় দেবতার পায়ে,
দেবতানিষ্ঠ দেব-মর্য্যাদা রাখে প্রাণ-মন-কায়ে।

নিজ ধর্ম্মেতে যার আছে প্রেম, ত্যজি স্বধর্ম্মপথে,
হয় না লুব্ধ সেজন কখন লোভনীয় কোন মতে।
বাণীর সেবক বিদ্যার্জ্জনে বিলাস-লালসাগুলি
বর্জ্জন করি পরবাসে রয় স্বজন বন্ধু ভুলি।

সত্যপ্রেমিক সত্যের তরে সহে অনর্থ কত।
আর্ত্তপ্রেমিক আর্ত্ত-সেবায় ধরে কি কঠোর ব্রত!
পিতামাতা ভ্রাতা দুহিতা বন্ধু পত্নী পুত্র আদি,
কোনো একটির প্রতি বেশী টান, প্রকৃতির ইহা ব্যাধি (?)

প্রাকৃত নর প্রেম-ব্যাধি হতে মুক্ত কেহই নহে ;
জড়জগতেও প্রেমের বন্যা এইরূপ বেগে বহে।
জাতির প্রেমিক, দেশের প্রেমিক, দশের প্রেমিক হয়ে,
দেবের আসনে বসেছে মানব দুখের অবধি সয়ে।

হৃদয়-মুকুরে বিম্বিত হলে প্রেমের মোহন হাসি,
কোটি কোটি প্রাণ হয় বলিদান প্রেম-যূপকাঠে আসি।
ধর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মক্ষেত্র—সব, প্রেম দিয়ে গড়া,
প্রেমের ভিত্তি যার যত দৃঢ়, তার দাম তত চড়া।

প্রাকৃত নর প্রেমের উপর করে না আঘাত কভু ;
কেমনে আঘাত করিবে সে-প্রেমে প্রেমিকশ্রেষ্ঠ প্রভু।
ভোগ্যাভোগ্য নাই তার তবু প্রেম-মর্য্যাদা রাখি,
দেখে কুসুমের নানান্ ভঙ্গী নয়নপথেতে চাখি!

শ্রীরাধা স্বয়ং স্বরূপশক্তি সখীরা বিলাসরূপা—
যোগমায়া বলে হয়েছে সকলে পরনারী-অনুরূপা।
ঐশ্বর্য্য ও মায়া মিশ্রণে সৃজিয়া ব্রজের লীলা,
বহির্মুখেরে বিমুখ করিয়া প্রেমেতে গলাল শিলা।

গোলোকের এক অঙ্ক প্রকাশ করিল ভূলোকে এসে,
মোহিনী শক্তি বামেতে লইয়া দাঁড়াল মোহন বেশে।
সুধুই হাস্য-লাস্য-বিলাসে করি রস বরিষণ,
গোপাঙ্গনায় মোহন মন্ত্রে করিল আকর্ষণ।

নিল দেহ মন লজ্জা-বসন দধি ও মাখন আদি—
আপনার বলে নিল সে-সকলে, পরের কি নিত সাধি।
পূর্ণকামের অপূর্ণতার কোথায় সম্ভাবনা ?
ব্রজাঙ্গনার কামনায় সুধু কাঙ্গাল হল সে জনা।

"নারীলম্পট কৃষ্ণ"—কেহ এ অভিযোগ যদি আনে,
সে মুরলীধর হলে ঈশ্বর, হয় না তাহার মানে।
সূক্ষ্ম ও স্থূল যা-কিছু বস্তু, ব্রহ্মব্যতীত নহে।
জড়-জঙ্গম-জগতে হরির পর কোনটিরে কহে ?

নিজ নগ্নতা কে না দেখে নিজে ?—তাহে কী শ্লীলতা যায় ?
অহরহ মনে করে সে রমণ—ছুঁলে দোষ দেহটায়।
ব্রহ্ম হইতে দেহ কি পৃথক্ ?—এর উপাদানগুলি
অব্রহ্মের কটাহ হইতে কেহ কি এনেছে তুলি ?

ব্রজের কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথি-রূপে
জ্বালিল জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো জগৎ-অন্ধকূপে।
ধনঞ্জয়ের হল জ্ঞানোদয় বিরাট মূরতি দেখে,
অখিল ভুবন দেখিল পৃথক্ নহে সে-ব্রহ্ম থেকে।

গীতাশাস্ত্রেতে রয়েছে প্রমাণ—সে ত' সেই গোপ-হরি—
হরিল গোপীর দেহ প্রাণ মন যে জন ছলনা করি।
অদ্ভুত লীলা! যোগ ও মায়ার অদ্ভুত সমাবেশ।
ঐশ্বর্য্যের চরম প্রকাশে মায়ার নটিনী-বেশ।

গোলোকে রসের আলোক জ্বালিয়া দর্পণাগার মাঝে
মোহন নটনে নাচেন রাধিকা, চরণে নূপুর বাজে
কৃষ্ণে ঘেরিয়া হ্লাদিনীশক্তি—গান্ধর্ব্বিকা নাচে,
প্রতিবিম্বিত হয় সেই রূপ শিশমহলের কাচে!

ঊর্দ্ধে ও অধে ঝলকে সে রূপ হয়ে অপরূপ অতি,
বিম্বিত হয় প্রতি দর্পণে ধরি বিভিন্ন গতি।
গোলোকের শিশমহল-দৃশ্য লীলায়িত হয়ে ভবে,
হইল রাধার অঙ্গবিলাস গোপ-অঙ্গনাসবে।

সেই রাধা, সেই কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সব গোপনারী
করিল গোলোকলীলা-অভিনয়-মুনিজনমনোহারী।
নাই ব্যভিচার, নাই অনাচার, নাই এতে কোনো গ্লানি;
বহির্মুখেরা দেখে মায়াময় ভুল-যবনিকাখানি।

কর্ম্ম করিয়া রহে অকর্ত্তা, ভোগ করি নাহি করে,
কমলপত্রে জলের মতন কোনো দাগ নাহি ধরে,
এ হেন ব্রহ্মে দোষারোপ কভু করে না বিজ্ঞ জনে;
"কামুক কৃষ্ণ" পরিলক্ষিত হয় কামুকের মনে।

ব্রহ্মাণ্ডের বহু পরিচয় দিয়াছেন ব্রজে হরি ;
প্রেমোৎকর্ষে সে ঐশ্বর্য্য হয়নি কার্য্যকরী।
পূতনা-বিনাশ, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন আদি কত,
দামবন্ধন, কেশীমর্দ্দন আদি লীলা শত শত—

হল পরাজিত ঐশ্বর্য্যের চরম বিকাশগুলি,
নন্দকুমারে হেরি ব্রজজন ঈশ্বরে গেল ভুলি।
যোগ ও মায়ার প্রতিযোগিতায় জিনিয়া যোগের বল,
লীলা-পঙ্কজ ফুটিল ছড়ায়ে প্রেমরূপ পরিমল।

একদা কৃষ্ণ কহে গোপীগণে, "যমুনার কাছে গিয়া
কহ, 'কালিন্দী, পথ দেহ' সবে, যাইব পসরা নিয়া।
যদি কানু হয় অকামী অভোগী সুচির-ব্রহ্মচারি
জীবনে কখনো পরশন যদি না করিয়া থাকে নারী,

তবে দেহ পথ, রবিনন্দিনী, কৃষ্ণ-নির্দেশ ইহা,
কানু কামী হলে থাক এইরূপ প্রখরা মূরতি নিয়া।
এই কথা শুনি যতেক রমণী হাসিয়া পড়িল ঢলি,
বলে "জানি মোরা কিরূপ ব্রহ্মচর্য্য তোমার, অলি!

তবু তব কথা শুনিব আমরা কৌতুকবশে আজি,
এখনি উঠিবে তোমার সুযশ-বাদ্য ভুবনে বাজি।"
বলি যায় চলে যত বামাদলে পসরা লইয়া শিরে,
উপনীতা হল ভাদ্রের সেই ভরা যমুনার তীরে।

বলে ডাকি, "আয়. শুভে, কালিন্দী, শুন আমাদের বাণী,
তোমার নিকটে পাঠাল মোদের সুন্দর বেণুপাণি।
যাইব আমরা মথুরানগরে পসরা লইয়া আজ,
বেলা বেড়ে যায়, দেখি না ত হায়, তরণী কিম্বা মাঝি।

বর্ষায় তুমি হয়েছ প্রখরা, আমরা অবলা অতি,
এবে দয়া করি শুকাইয়া বারি পথ দাও, গুণবতী।
কৃষ্ণ বলেছে, 'যদি হই আমি সুচর-ব্রহ্মচারী,
তবে দিবে পথ যমুনা এখনি সরায়ে আপন বারি।

কানুর আদেশ কহিলাম মোরা, শুন, গো, হরিপ্রিয়ে।
পথ দাও করে, যাই পরপারে দধির পসরা নিয়ে।"
এই কথা শুনি যমুনা তখনি শুকাইয়া গেল মাঝে,
দেখি এই লীলা, ভাবে গোপবালা গালে হাত দিয়া লাজে।

বুঝিতে না পারে, বিস্ময়ে সবে রহে স্তম্ভিত হয়ে,
দৈব ভাবিয়া পরে সেই পথে চলিল পসরা লয়ে।
এইরূপ মাতা পিতা সখাগণে দিয়াছিল পরিচয়—
কভু দাবানল পান করি, কভু নাশিয়া অসুর-ভয়,

বদনে দেখায়ে নিখিলবিশ্ব, কালিয়নাগেরে দলি;
ব্রজবন্ধুবে ত্যজি তবু তারা ব্রহ্মে গেল না গলি।
ভক্তের কামে হল কামতরু অভিমত ফলদাতা,
যশোদাদুলাল! গোপীবল্লভ! বলদাউজীর ভ্রাতা!

যোগ ও মায়ার সমাশ্রয়েতে সে মহাযোগীশ্বর,
নাদব্রহ্মের মহিমা বুঝাতে হইল বংশীধর।
এ ব্রজলীলায় বাঁশরী সহায় করিল সে শ্যামশশী—
যোগৈশ্বর্য্যময়ী সে বংশী অঘটনপটীয়সী।

সুরাকর্ষণে টানে ব্রজজনে, মনেতে প্রবেশি বলে
কৃষ্ণাসক্তি শিখায় বংশী মোহন সুরের ছলে।
বংশীস্বনে জড়ে ও চেতনে বিপ্লব করি হরি,
কুলের কামিনী, তাহাদের টানি অকূলে বাহিল তরী।

কভু অনুলোম, কখন বিলোম—ওতপ্রোতে সুর চলে,
পাথরে লৌহে দিল কোমলতা, কঠিনতা দিল জলে।
যাহা অনুলোমে হইল উষ্ণ, বিলোমে জুড়াল তাহা—
জড়ে এই দশা, বলা বাহুল্য চেতনে হইল যাহা।

আশ্চর্য্যের অবধি কিছুই রাখিল না ব্রজে হরি ;
তবু "ননীচোর" রহিল, গোপীরা "ব্রহ্মে" নিল না বরি।
হেন মাধুর্য্যময়ী ব্রজভূমি—যাহার মাধুরীধারা
সে আশ্চর্য্যময়েরে করিল বালক-রাখাল-পারা।

খায় ঝুটা ফল রাখালের সনে, "অতি সুমিষ্ট" বলি,
খেলায় হারিয়া কাঁধে লয় সবে সখ্য-প্রেমেতে গলি ;
হয়ে 'কাণামাছি' যায় নাচি নাচি বালক-সঙ্গী-সনে,
দেখিয়া ব্রহ্মা মহাসন্দেহে হরিল সুরভিগণে।

কানাই-বলাই-ব্যতীত সকল রাখাল বালকে লয়ে
মোহাচ্ছন্ন করি কন্দরে রহে সতর্ক হয়ে,
নব লাখ গাই সাজিল কানাই, আর গোপ শিশু যত,
রহিল বর্ষ অবধি—বিধির ভ্রান্তি হইল গত।

ইন্দ্র-পূজার প্রতিবাদ করি দাঁড়াল বালক-হরি ;
পক্ককেশেরা শুনিল সে কথা কুলাচার ত্যাগ করি।
নানা উপায়ন করি আয়োজন পাহাড়ে পূজিল সবে,
মূর্ত্তিমন্ত দেখি পর্ব্বতে পরমানন্দ লভে।

যত ভোগ যায়, খায় গিরিরায়, কৃষ্ণ যোগায় আসি,
দেখিল চক্ষে অদ্ভুত এই লীলা সব ব্রজবাসী।
মায়ামূর্চ্ছিত যত নরনারী যন্ত্রচালিত হয়ে
গিরিরাজপূজা সারি সবে আসে প্রাণের কানুরে লয়ে।

ক্রুদ্ধ হইল দেবরাজ দেখি ব্রজের এ দুর্ম্মতি,
চৌরাশী ক্রোশে করে বর্ষণ আসিয়া শীঘ্রগতি।
বর্ষাপ্লাবনে ভেসে যায় দেশ, সবে করে হাহাকার।
বালক কৃষ্ণ সে তুফানে আসি হইল কর্ণধার।

কন্দুকসম নিল সে হস্তে গোবর্দ্ধনেরে তুলি,
ছত্রের মত তুলিল উর্দ্ধে দিয়া এক অঙ্গুলি ;
তার তলে রাখে নরনারী সব, আর পশু-পাখী যত,
সপ্তাহকাল ঘোর বর্ষায় রহে শিশু এইমত ;

নহে সে যুবক, নহে সে কিশোর, সে স্থধু দুধের ছেলে
ধরি গিরিরাজ সবার অগ্রে যাদুকরী খেল্ খেলে।
হারি সব বল, ইন্দ্র বিকল হইয়া আসিল তথা,
চিনি হৃষীকেশে, দন্তে নিল সে শুষ্ক তৃণ ও লতা।

ইঙ্গিতে বলে, 'আমি পশু, তুমি পশুপতি, ওহে, হরি,
ক্ষমা কর দাসে পশুগণোচিত দণ্ড প্রসাদ করি।
পূজার অন্তে গেল সে ইন্দ্র, যখন ক্ষমিল প্রভু ;
ইহার পরেও "চোর-চূড়ামণি" সখীরা ডাকিল তবু।

অদ্ভুত মায়া, আজো তার ছায়া বহিরঙ্গের মাঝে
করিছে রঙ্গ বিষতরঙ্গ তুলি ভুজঙ্গ-সাজে।
ব্রজবাসীসম নাই প্রেম-প্রীতি, আছে কুতর্ক খালি,
"ব্রজের কৃষ্ণ লম্পট" বলি দেয় অকারণ গালি।

সে গালি দিবার নাই অধিকার অন্য কাহারো ভবে,
স্থধু ব্রজবাসী তারে ভালবাসি গালি দিয়া প্রেম লভে।
বোঝে না অন্ধ, গোকুলচন্দ নন্দরাজের ঘরে
দিল একাদশ-বর্ষ-বয়সে লীলাখেলা শেষ করে।

নব কৈশোরে দিয়েছে চরণ, ফোটেনি দেহেতে তাহা
এমনি বয়সে গিয়া মথুরায় শ্রীহরি করিল যাহা,
ভাগবতে তাহা হয়েছে উক্ত, বলা বাহুল্য হেথা ;
অদ্ভুত লীলা ! অদ্ভুত খেলা !! অদ্ভুত অভিনেতা !!!

ঐটুকু ছেলে গিরি ধরে হেলে, করে মহারাস-ক্রীড়া ;
তারে "কামী" বলে কামুকসকলে, নাই কি কিছুই ব্রীড়া।
ব্রজমাধুর্য্যে বঞ্চিত খল, মক্ষিকাসম গতি,
কুসুমগন্ধ ত্যজিয়া অন্ধ, পূতিগন্ধেতে মতি।

বিপিনবিহারী ব্রজে সুধু 'হরি', 'যুগকর্ত্তা' সে নহে ;
মথুরা-দ্বারকা-লীলায় তারেই যুগের কর্ত্তা কহে।
এ ব্রজলীলায় কেবল হরণ—নবনীত প্রাণ মন,
ভাব অনুরূপ ফলদান, আর বলে স্নেহাকর্ষণ।

হরে অসুরের জীবন, সুরের গর্ব্ব লইল কাড়ি,
গোপিকার ধন—দধি ও মাখন, নিল গিয়া বাড়ী বাড়ী ;
নন্দ-যশোদা-হৃদয়নিহিত স্নেহ-বুভুক্ষারাশি,
হরে নিল হয়ে অনুপম শিশু অপুত্রতায় নাশি।

পুতনা-বক্ষে ছ'দিনের শিশু, স্তন্য দুধের সাথে
নিল প্রাণ টানি, ছুটে এলো রাণী ভয়কম্পিত গাত্রে,
"ষাট ষাট" বলে কোলে নিল তুলে অশুভ-শান্তি করি ;
রাখিল 'শকট'-তলে, কৌশলে তারও প্রাণ নিল হরি।

অঘ, বক, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি নিত্যই কানু মারে,
হরণ-যজ্ঞে জীবন-সমিধ পড়ে যেন ভারে ভারে।
বাহিরে ভূভারহারীর কার্য্য চলিছে মহোৎসবে,
মনোমন্দিরে করিল প্রবেশ, এবার দেখিল সবে।

নন্দকিশোর সত্যই চোর 'হরি' নামে যায় জানা,
বলিতে আপনা কিছুই রাখে না, না মানি কাহারো মানা।
হরণ করাই হরির স্বভাব, তাই তার নাম হরি।
চুরিবিদ্যার হাতেখড়ি তার নিজেরেই চুরি করি।

ভরা ভাদ্রের ঘন বর্ষায়, মথুরার কারাগারে,
গভীর রজনী, কৃপাণহস্ত প্রহরী জাগিছে দ্বারে,
দেবকীগর্ভে জনমিল চোর 'বাসুদেব' নামা হরি,
চারিটি হস্তে শঙ্খচক্র গদা ও পদ্ম ধরি।

জনমি সদ্য দিল উপদেশ পিতা ও মাতায় যাহা—
অতি অদ্ভুত অতি সুন্দর চৌর্য্যবিদ্যা তাহা।
নিজে চোর, করে পিতারেও চোর স্নেহেতে আতুর করি,
বলে' "লয়ে চল এখনি গোকুলে গোপনে কোলেতে ধরি ;
আমার মায়ায় সবে নিদ্রিত, চল এই অবসরে।"
বলি, দুই কর করিয়া গোপন শিশু-আকৃতি ধরে।
আপনি মুক্ত হইল দুয়ার, শৃঙ্খল গেল খসে,
হরি নিয়ে এল আপনারে আপনার মায়াবশে।

চৌর্য্যব্যাপারে ক্রম-উন্নত ক্রমেই কৃষ্ণ হয়ে,
প্রথমে মায়ের দধি-মন্থনী টানাটানি করে লয়ে।
হামাগুড়ি-শেষে দাঁড়াইল হেসে প্রাঙ্গণে পদ দিয়া ;
পরে প্রতিবাসী-গৃহে-গৃহে আসি' দেখা দেয় সখা নিয়া।

ক্ষীর সর দুধ, দধি ও মাখন, তক্র ঘৃত ও ছানা—
গোপ-সম্পদ এ-সব গব্য, হরিল না মানি' মানা!—
মোহন রূপেতে মন নিল' হরি' হৃদয়াঙ্গনে আসি',
দেহ লয় টানি' কাননে কুঞ্জে বাজায়ে মোহন বাঁশী!

কিন্তু তখনো নারীর ভরম সরমে জড়ায়ে ধরি।'
ছিল গোপবালা,—সে নিঠুর কালা তাহাও লইল হরি'!
বস্ত্রহরণ-লীলার ছলেতে বাহিরে টানিয়া আনি',
হরিল গোপীর শেষ সম্বল লাজ-আবরণখানি!—

বহু রূপ ধরি' আজো সেই হরি চুরি করে ঘরে ঘরে,—
হ'য়ে নির্দ্দয় সব হরি' লয়, রাজায় ভিখারী করে!
বিধবার শেষ সন্তান, আর অন্ধের লাঠিখান—
দেখিলে ভক্ত, হইয়া শক্ত তাহাতেও দেয় টান!

রাজার পুত্র রঘুনাথদাস, তা'রে দিল' হেন ব্যাধি—
ভোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া যুবক সভয়ে উঠিল কাঁদি!
সুখের বাঞ্ছা নিল তা'র হরি অতি প্রিয়জন বলে!
রূপ-সনাতনে সেই ভাবে টেনে পথে এনে নিল কোলে!

মীরায় ক্ষিপ্তা করি আনে হরি রাজ মর্য্যাদা-লাজে!
লালাবাবু হল পথের ভিখারী বৃন্দারণ্যমাঝে।
তুলসীদাসে সে করিল পাগল, 'লীলাশুক' ক্ষেপে গেল।
নানক, খ্রীষ্ট, বিজয়কৃষ্ণ সব ছেড়ে ছুটে এল!

এই ত সেদিন গদাধরদাস ব্রজেতে ত্যজিল দেহ—
চোখের সমুখে ঘটেছে মোদের. মিথ্যা ভেব না কেহ।
হুগলীতে ঘর, দাস-গদাধর শৈশবকাল হতে,
মাথুর-যাত্রা শুনিয়া বিরহে কাঁদিয়া বেড়াত পথে।

মথুরা হইতে কৃষ্ণে আনিবে, এই আশা বুকে লয়ে.
ছেড়ে এলো গেহ, জননীর স্নেহ, কৌপীনধারী হয়ে।
ব্রজের ধূলায় কাঁদিয়া লুটায় "কোথায়, কৃষ্ণ" বলি,
দাবানল-বনে দিল দরশন আসিয়া রসিক অলি।

ব্রহ্মকুণ্ডবাসী গদাধর আসি দাবানল-বনে,
লীলায় পশিল বাংলা তেরশ-তেতাল্লিশের সনে।
নবযৌবনে মায়ের বাছায় হরিয়া আনিয়া হরি,
বৃন্দাবনে শ্রীপঞ্চমী-দিনে নিল সঙ্গিনা করি।

পুরুষ-আকার ছিল বটে তার, কিন্তু মনেতে নহে,
বাহ্যচেতনা তাহার ছিল না— সাধনা ইহারে কহে।
এই ভাবোদয় হলে নাহি রয় জীবন দেহেতে কভু।
বিরহের ব্যথা গদাধর দাসে দেখায়ে বুঝাল প্রভু।

যদি অনুরাগে কেহ নাহি জাগে, তারে কষাঘাত করে
ধন জন মান স্বাস্থ্য হরিয়া নিজ পথে আনে ধরে।
নাশিতে সে চায় নিজ করুণায় জীবের উপাধিগুলি—
তাহার এবং জীবের মাঝারে যা আছে প্রাচীর তুলি।

খেলায় মত্ত সন্তান দেখে লয় সে খেলনা কাড়ি,
সবে যায় ছেড়ে, কিন্তু দয়াল দুরিতে যায় না ছাড়ি।
ছোট বড় নাই, সমান সবাই হয় তার কাছে গেলে।
করে সে নৃত্য দু'হাত তুলিয়া শ্বপচেরও প্রেম পেলে।

দণ্ডকবনে যত তপস্বী শ্রীরামচন্দ্রে দেখে
পতি-ভাবনায় মোহন মূরতি হৃদয়ে লইল এঁকে।
মাগিল সকলে অভিমত বর দয়াল রামের কাছে,
দিল ভগবান্ সেই বরদান, শুনি মুনিগণ নাচে।

অন্য বাসনা ভুলি মুনিগণ গড়ে সেতু-মনোময়,
উপাদান তার, প্রেম-কামনার ; কাম-কামনার নয়।
সেই পথ ধরে এল সে দ্বাপরে বাঞ্ছিত-ফল-দাতা,
সঙ্গে ভক্তি—হ্লাদিনীশক্তি, সঙ্কর্ষণ-ভ্রাতা।

যখন ভুবন অসুরের পাপে হইল ক্ষুব্ধ অতি,
অত্যাচারের অনলে দগ্ধা হইলেন বসুমতী ;
ধর্ম্মের গ্লান দেখিয়া পাষাণ-প্রতিমা উঠিল ঘেমে,
তখনি প্রেমের সরস বরষা ভূতলে আসিল নেমে।

নবীন নীরদ উদয় হইল ব্রজমণ্ডল মাঝে,
বিজলিমালায় জ্বলিয়া অশনি অসুরেব শিরে বাজে।
ঝরিয়া পড়িল করুণার ধারা শ্যাম-নবঘন বাহি,
চাতক বাঁচিল, ময়ূর নাচিল শ্যামল জলদে চাহি।

সেই প্রেমধারা হইল সাকারা ব্রজে 'রাধা' নাম ধরি।
সেই নবঘন হল শ্যামঘন—সুন্দর ব্রজহরি।
ঘনীভূত আর তরলিত প্রেম 'রাধা' আর 'ধারা' হয়ে—
রসের প্লাবনে ভাসাল জগৎ রসিক ভকতে লয়ে।

যত ব্রজবালা রসিকশেখরে সেবিল রসোৎসবে—
ছিল আগে কেহ শ্রুতি, কেহ যতি, কেহ ব্রতী হয়ে ভবে।
অমৃতসার কথা এ লীলার, আছে ভাগবতে লেখা—
মায়ার নটনে বাজিল কেমনে যোগের মোহন ঠেকা।

সেই ঈশ্বরে দোষারোপ করে অল্পবুদ্ধি নরে,
মণ্ডুক হয়ে লঙ্ঘিতে যায় মহান্ রত্নাকরে।
আদি অন্ত ও মধ্য রহিত, বেদ যারে নাহি জানে,
"নেতি-নেতি" রব করে শ্রুতিসব নিজ নিজ স্তুতিগানে—

স্বেচ্ছাবিহারী সে স্বরাট্ হরি—সেই ত ব্রজের কানু।
—পবন যাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস, নয়ন শশী ও ভানু।
অগণন কর-চরণ-শীর্ষ ; অগণিত শ্রুতি-আঁখি,
নিবিড় বনানী ঘন রোমশ্রেণী, রয়েছে ভুবন ঢাকি—

অস্থি শৈল—নদ-নদীগণ শিরা-উপশিরা-স্নায়ু,
বহিয়া জীবন জড়ে ও চেতনে যোগায় যতনে আয়ু—
হৃদয় অগাধ সিন্ধুগর্ভ, প্রেমেতে উঠিছে দুলে—
দিশা কেশপাশ, কিরীট আকাশ, খচিত তারকা-ফুলে।

ষড়ঋতু যাঁর হৃদয়-বিকার, হাস্য বিজলিলতা,
ক্রোধ কাল, জ্বালা জিহ্বা-করাল, সৃষ্টি প্রসন্নতা ;
সেই ধারাধর—রাধাবর অধরে মুরলী ধরি,
রসোৎকর্ষ দেখাল বিশ্বে পরকীয়া-ছল করি।

কৃষ্ণেতে রতি, তাহারে 'সুগতি' বলেন বিবুধগণে,
কৃষ্ণেতে কাম, 'প্রেম' তার নাম, কামী 'কাম' ভাবে মনে।
কৃষ্ণের লীলা গলাইল শিলা প্রেমেতে কোমল করি,
কৃষ্ণদ্বেষী কঠোর হৃদয় গলিল না তাহা স্মরি।

কামের কামনা লব-পরিমাণ যার আছে মনোমাঝে,
পায় না সে কভু রাধা-দাসীত্ব, অথবা রসিকরাজে।
প্রকৃতি পুরুষে হয় সুমিলন, পুরুষে পুরুষে নহে ;
পুরুষে 'দাস্য' আদি অধিকার, 'মধুর' সুদূরে রহে।

'স্বাহা' মন্ত্রেতে করেন সাধন কৃষ্ণ-সাধকগণ,
কৃষ্ণচন্দ্রে আত্মস্নপন—লয়ে এ আকিঞ্চন
পুরুষ-প্রকৃতি-মিশ্র জগৎ, পুরুষ একাই হরি,
জড়জঙ্গমজগৎ-প্রকৃতি রয়েছে পুরুষে ধরি—

অজ্ঞানতায় পুরুষাভিমান আসে মায়াধীন নরে,
কৃষ্ণ-সুধায় সে দোষ ক্ষালিতে সাধক ইচ্ছা করে ;
অথবা কৃষ্ণ-কৃশানুগর্ভে পুরুষাভিমান হবি—
"স্বাহা স্বাহা" বলি ঢালি দিয়া দেখে আলোকে লীলার ছবি।

পাঁচটি হাজার বছর অন্তে এসেছিল পুনঃ হরি—
কৃষ্ণলীলার মাধুরী বুঝাতে শ্রীরাধার ভাব ধরি।
নিষ্কাম বিনা কৃষ্ণ-সাধনা কামীর সাধ্য নহে,
দেখাল সে পথ গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস-ব্রত লয়ে।

(রূপ সনাতন রঘুনাথ আদি সকলে ললনাত্যাগী)
ছোট-হরিদাসে করে বর্জ্জন নারীসম্ভাষা লাগি।
ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া দেখাল কৃষ্ণের কাম কিবা।
দেখিল না তবু পেচকধর্ম্মী আজো সে উজল দিবা॥

বিরহী শ্রীকৃষ্ণ

আজি বনালয়ে জিতকাম হরি বসেছে যোগীর সাজে ;
মদনমোহনে দেখিয়া মদন পলায়ে গিয়াছে লাজে।
বাক্য হারায়ে আছে সখী চেয়ে অশ্রুসিক্ত আঁখি,
দেখিতেছে যেন চন্দ্রে চকোরী লতার আড়ালে থাকি।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণে অনুরাগ যেন এসেছে শরীর ধরি,
পিয়ে প্রেম-সুধা মিটাইয়া ক্ষুধা রাধা-গৌরবে ভরি ;
বলিছে কানাই, "আদরিণী রাই, ত্যজ এ বিষম মান,
নতুবা তোমার চরণতলেতে এখনি ত্যজিব প্রাণ।

কর আজ, ধনী, কৃষ্ণেরে ধনী, কল্পলতিকা-রাই।
তব ছায়াতল ভিন্ন শীতল হইবার ঠাঁই নাই।
তুমি প্রাণাধার, নাই কিছু আর আমার এ তিন লোকে ;
তুমি বিনা, প্যারী, হয়েছি ভিখারী পড়িয়া বিরহশোকে।

হইয়া ভ্রান্ত অপরাধ যাহা করিয়াছি, প্রাণপ্রিয়ে,
জানি আশ্রিত ক্ষম সে সকল করুণার কণা দিয়ে।
ওগো, 'রাধা নাম! শুনি গুণগ্রাম ভুবনমাঝারে তব ;
তাই মোর বাঁশী গায় দিবানিশি তব যশ অভিনব।

নামী হতে বড় শ্রীনাম জগতে, তুমি রাণী নামগণে ;
পেয়ে সুবিচার পালনে তোমার সুখে থাকে প্রজাজনে।
আমি চিরদিন আশ্রিত তব, তোমা বিনা নাহি জানি ;
আজি বিপন্ন জানি অনুগতে, লও গো, চরণে টানি।"

"জয়, রাধে, রাধে!" বলিয়া বদনে শ্যামসুন্দর কাঁদে,
যেন শোক-রাহু গ্রাসিয়াছে আজ ফুল্ল শারদ চাঁদে।
দেখি এই দশা, ব্যথিতা ললিতা লুকায়ে রহিতে নারে,
লতা-আবরণ সরায়ে বাহিরে আসে বেদনার ভারে।

বিকল কৃষ্ণে দেখি ব্যাকুলতা তুফান তুলেছে বুকে ;
কিন্তু সে ব্যথা ব্যক্ত না করি রহিল শুষ্কমুখে।
যেন গুরুতর কার্য্যে কোথাও যেতেছে বনের পথে,
দেখেনি কাহায়, এইভাবে যায় বেতস কানন হতে।

বাজিয়া উঠিল চরণে নূপুর, কটিতে কাঞ্চীমালা—
শুনি ভূষণের নিক্কণ, চাহে চমকি চিকণকালা।
ললিতায় দেখে কানু কহে ডেকে, "ওগো, রাধা-সহচরী,
এস একবার নিকটে আমার করুণা প্রকাশ করি।

শোন শোন কথা, বলি যাও কোথা, ওগো, ও গোপের বালা,
রাধার প্রেয়সী, শোন গো শ্রেয়সী, আমার মরম-জ্বালা।”
শুনি সেই কথা, রূপসী ললিতা বাহু তুলাইয়া চলে,
লীলায়িত গতি দেখি পড়ে রতি ললিতার পদতলে।

বদন ফিরায়ে ভ্রূযুগ বাঁকায়ে, বলে, “কেন পিছে ডাকো?”
কানু বলে, “সই, সবিনয়ে কই, আজি মোর কথা রাখো।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে মোর নিবেদন শুনে যাও, প্রিয় আলি,
পরে যেও যথা অভিরুচি তথা, রোধিবে না বনমালী।

শোন, কৃশোদরী, তব ঈশ্বরী রাধিকা আছেন যথা,
দীনের মিনতি, ওগো, দয়াবতী, যাও তুমি এবে তথা।
গিয়া রাই-পাশে, কহ, ‘ক্রীতদাসে কেন ত্যজ, সহচরী,
হয়ে থাকে দোষ, এবে ত্যজ রোষ দণ্ড-প্রসাদ করি।

শোন, প্রাণসই, আমি রাধাবই আন কিছু নাহি জানি;
ধর্ম্ম অর্থ—সকলই রাধিকা, রাধা প্রাণ, আমি প্রাণী।
রাধার করুণা-সম্পদ হতে বঞ্চিত বলে আজি,
দেখ, ঋতুরাজ জ্বালা দিতে আজ কাননে এসেছে সাজি।

করে বিদ্রূপ, দেখ, ঋতুভূপ করপল্লব নাড়ি,
বকুলে মুকুলে, আর ফুলে ফুলে দিয়েছে গরল ছাড়ি;
লতায় পাতায়, মলয় হাওয়ায় ঢেলেছে অনলরাশি,
চন্দ্র হইতে সুধা নিঙাড়িয়া রেখেছে জ্বালার হাসি,

চৌদিকে রাখি মরীচিকা-জাল, করেছে ভয়াল অতি,
মনোমৃগ ধায় দারুণ তৃষায়, হাসে দেখি সেই গতি।
আম্রের শাখে বসিয়া শায়ক-চূতমঞ্জরী ধরি
করিছে লক্ষ্য মদন, মাদন মন্ত্রেতে পূত করি।

তাই সব বন করি বর্জ্জন এসেছি বেতসবনে,
এখানেও মার করিছে প্রহার আসি সমীরের সনে।
কহে শশিমুখী—"হে, কপটদুখী, বহুবল্লভ হরি,
কেন কহ মিছা?—দংশিছে বিছা তব আচরণ স্মরি।

রূপের আগরী ব্রজের নাগরী—প্রতি ফুলে খাও মধু,
তুমি যাহা বট, হে, কপট নট, জানি তাহা প্রাণবঁধু।
তুমি ষড়ঙ্ঘ্রি, ষড়্রস বিনা একেতে তুষ্ট নহ,
তাই নানা ফুলে করি বিচরণ নব নব স্বাদ লহ।

চক্রবাকের মত তব বাক্ অবাক্ করিল মোরে,
স্বাদগ্রাহী হয়ে সাজিতেছ সাধু সুধুই মুখের জোরে।
লম্পটরাজ এই ব্রজমাঝ তুমি বিনা কেবা আছে,
রাধা-কাঞ্চনে সংযোগ কেবা করিবে এ হেন কাচে।

আমি যাই কাজে, কাজ নাই ব্যাজে, হল বিলম্ব বহু,
বলি যেতে চায়, দূরে পিকরায় বলে, "রহু, রহু, রহু।"
যায় সুঅঙ্গী করিয়া ভঙ্গী—বাঁকা কামধনু-ভুরু;
চলে যেতে চায়, বাধে পায় পায় গুরু নিতম্ব-উরু।

কাঁটায় আঁচল গেল জড়াইয়া—নূপুর চরণে ধরি
যেন বলে, "সখি, যেও না, একাকী ফেলিয়া প্রাণের হরি।"
দেখি এ রঙ্গ পুলকে অঙ্গ, জয়দেব-কবি হাসে।
ভারতীর বীণে মোহন নটনে সুর-'ছায়ানট' ভাসে।

পুষ্পিতা-লতাসম দেহখানি এপাশে ওপাশে দোলে,
চারু অঞ্চল চঞ্চল হয়ে কাঁপিছে কাঁটার কোলে ;
ফিরি অপাঙ্গে হরির বদন হেরে বরাঙ্গী বামা,
জ্বরগ্রস্তে পরখে যন্ত্র যেন 'তাপমান'নামা।

যুড়ি দুই হাত করে প্রণিপাত কৃষ্ণ নিকটে আসি,
বলে, "সহচরী করুণা বিতরি ক্ষম কৃত দোষরাশি।
শরণাগতের অপরাধ কভু সাধুগণ নাহি ধরে।
মহতের দ্বার সতত মুক্ত শরণাগতের তরে।

চির-আশ্রিত আমি তোমাদের, তবে কেন বল, আলী,
নিঠুরার প্রায় ত্যজি অভাগায় যেতেছ অনল জ্বালি।
রাধাহীন প্রাণ দিব বলিদান, ভাবিয়া এসেছি বনে,
যাবে, যাও চলে, অন্তিমকালে দেখা হল তব সনে।"

এই কথা বলি পিচ্ছমৌলি মৌনী হইয়া রহে,
অশ্রুপূরিত নলিন-নয়ন মর্ম্মের কথা কহে,
সখী ভাবে মনে, আর অযতন রতনে উচিত নয় ;
"হলে অতিশয়, ফল ভাল নয়"—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।

ভাবি বলে আলী, ওহে, বনমালী, চল তবে লয়ে যাই,
চরণে ধরিলে ক্ষমিতেও পারে করুণারূপিণী রাই।
করিব যতন তোমার কারণ, যেতে চাও, চল সাথে,
শুনি আনন্দে চলে গোবিন্দ পুলকাঞ্চিত গাতে।

যায় আগে পাছে ললিতা কৃষ্ণ বনপথ আলো করি,
দূতী-কুঞ্জরী লয়ে যায় যেন, কুঞ্জররাজে ধরি ;
কিম্বা ভক্তি ভগবান্ যেন ধরেছে যুগলতনু,
মেঘে লয়ে সাথে যায় বনপথে অথবা ইন্দ্রধনু।

সুধা-সমুদ্র বেলা ছাড়ি যেন চলেছে তটিনীসনে,
ভরণী-সঙ্গে যেন নিশামণি রোহিণীরে খোঁজে বনে ;
ব্রজের "নবীন মদন" চলেছে মন্মথ-মন মথি,
তার সাথে যায়, কামিনী এ নয়, কৃষ্ণ-চরণে রতি।

মুগ্ধ মাধব চলিয়াছে আজ মাধবীর দরশনে.
দ্যুলোক হইতে রূপের আলোক দেখিছে দেবতাগণে।
ললিত ভঙ্গী, ললিতা সঙ্গী, লীলাচঞ্চল আঁখি—
ঢালে ললনার হৃদয়ে লালসা, হেরে যেই দিকে বাঁকি।

লতা পাতা ফুল দুলিয়া দোদুল স্বাগত সুধায় সবে,
বিশাল নয়ন তুলি মৃগীগণ লোচনের লাভ লভে ;
খঞ্জনা নাচে, যায় আগে পাছে শুভের সূচনা করি.
শ্যামা দেয় শিস্ করিয়া আশিস্, চাস বসে শাখা ধরি।

গেছে বনালয় শ্যামতায় ছেয়ে, তাই গ্রীবা তুলি তুলি,
আসে অহিভুক্ হয়ে অহিমুখ, ভোজন-ভাবনা ভুলি ;
মৃণালের মত তুলিছে ভয়াল ফণী সে চঞ্চুপুটে,
মেঘ-দরশন-আশে পাখা তুলি বিহ্বল শিখী ছুটে।

হইয়া সলিল বহিছে অনিল নিচোল আঁচলে ঘেরি,
বনদেবীগণ ফুল বরিষণ করে চাঁদমুখ হেরি।
পড়ে তালে তালে পদ ভূমিতলে, চুমি তাহা তৃণগুলি
হইল ধন্য জগৎমান্য হল নগণ্য ধূলি।

আশায় আশায় যায় শ্যামরায় শঙ্কায় লয়ে পাশে ;
পূর্ণকামেতে কামোৎপত্তি, হেরিয়া কামনা হাসে।
দিল মাধুর্য্যময়ী ব্রজভূমি কামনায় হেন গতি,
বৈরাগ্যের ভাগ্যে যা কভু লেখেনি সৃষ্টিপতি।

জয়দেব-কবি দেখি এই ছবি হল সম্বিৎহারা,
'কচ্ছপী' বীণে মধুনিক্কণে বাজিল 'ডার-ডা-ডারা' :
লয়ে জয়ন্তী, 'জয়-জয়ন্তী' বলে, "ভক্তের জয়।
ভগবান্ হন ভক্তের শুধু, অন্য কাহারো নয়।"

কুঞ্জের দ্বারে আসি এইবার দাঁড়াইল দুইজনে ;
কৃষ্ণের চিত্তে শঙ্কা, বিজয়-গর্ব্ব সখীর মনে।
যত সখীগণ করে দরশন শঙ্কিত শ্যামচাঁদে ;
যেন মাতঙ্গে এনেছে ধরিয়া কুঞ্জর-ধরা ফাঁদে।

কুঞ্জের দ্বারে প্রতি গোপিকারে দীন আঁখে হেরে হরি।
ভক্তাধীনতা এত না থাকিলে, কে কাঁদিত তাঁরে স্মরি।
দেখে সব সখী সুভ্রূ সুমুখী বাঁকা বাঁকা আঁখে চেয়ে ;
হৃদয়-পদ্ম ফুটিল যেন গো, রবির কিরণ পেয়ে।

কিন্তু গোপন করিয়া সে মন, যায় যে-যাহার কাজে—
কেহ না স্বাগত সম্ভাষে আজ নিখিলবিশ্বরাজে।
ললিতার সাথে কম্পিতগাতে ভীত ভগবান্ চলে,
যেন মৃগরাজ পড়িয়াছে আজ হরিণীগণের ছলে।

শ্রীমতী রাধায় সংবাদ ত্বরা দিল আসি সখীগণে,
"কুঞ্জে প্রবেশ করিল কৃষ্ণ ললিতাদেবীর সনে।"
শুনি আনন্দে বিহ্বলা রাধা, আঁখিতে অশ্রু ঝরে
কিন্তু সখীর আদেশ স্মরিয়া সে-ভাব গোপন করে।

কপট-মানিনী হইল রাধিকা বসনে বদন ঢাকি,
নয়ন-চকোরী কাঁদিয়া উঠিল অবগুণ্ঠনে থাকি।
নিদারুণ ক্ষুধা, সম্মুখে সুধা, খাইতে না পায় তবু—
সেবিকা হইয়া হয়েছে ললিতা আজ রাধিকার প্রভু।

আসি উপনীত হইল নাগর নাগরীর পদতলে,
বামা রাধিকায় হেরিয়া নয়ন ভরিয়া আসিল জলে ;
গদগদ্‌বাণী হল বেণুপাণি, সরে না বচন ত্বরা—
কেলিকদম্বপ্রায় শ্যামাঙ্গ হল রোমাঞ্চে ভরা।

হয়ে সংযত আনতশীর্ষে বসে শ্রীচরণতলে ;
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ, নয়ন-কমল ভাসিল জলে :
নিজে ভগবান্ শ্রীরাধায় মান দিবে বলি এল আজ,
সোহাগের সাড়া পেয়ে অনুরাগ পরিল রাগের সাজ।

ভারতীর কাছে এল 'দেশাবরী' আরতির দীপ ধরি,
কুসুমাঞ্জলি লয়ে রাগমালা দাঁড়াইল আলো করি।
উপাসনা আসি মানের কণ্ঠে পরায় বিজয়মালা,
অনুরাগে রাগ-রাগিনীরা পূজে লইয়া বরণডালা।

যুগল সেবিকা যতেক গোপিকা আসিয়া দাঁড়ায় সবে,
দেখে এক দিঠে—সাধ্য সাধন মিলেছে মানোৎসবে।
সাধ্য সাধিছে সাধিকায় আজ প্রেম-সাধনার ফলে
অচলা নিষ্ঠা আনে অভীষ্ট এমনি সুকৌশলে।

মুগ্ধা ভারতী করিছে আরতি মানিনী রাধায় আজ—
যাঁরে দিল মান নিজে ভগবান্ অবতরি ব্রজমাঝ।
অবগুণ্ঠনে থাকি রাধা-বিধু চাহে না বঁধূর দিকে,
পুলকিত দেহে অবনত হয়ে নখেতে ধরণী লিখে।

নটবর কানু বলে—"ত্যজ" মান, অয়ি, চারুশীলে রাধা,
আমি অনুদিন তোমারি অধীন, আছি ও'চরণে বাঁধা।
হয়ে থাকে দোষ, এবে ত্যজি রোষ কহ কথা, বিধুমুখি,
দন্ত-রুচির-কৌমুদী-দানে কর এ চকোরে সুখী।

বেশী নয়, যদি একটি বচন কহ, প্রিয়ে, তুমি হাসি,
হৃদয়-তিমির হবে অপগত পেয়ে সে জ্যোৎস্নারাশি।
ফুল্ল অধরে সদা সুধা ঝরে মুখ-চন্দ্রমা বাহি,
নয়ন-চকোর কাঁদিছে তাহার একটি বিন্দু চাহি।

দেখ, বিষাক্ত বিশিখ মদন করিছে প্রহার মোরে,
শ্রীমুখ-কমল-মধু-দানে, প্রিয়ে, লও তার বিষ হরে।
সত্যই যদি হয়ে থাকে দোষ, করিয়া দণ্ডাদেশ,
সব পাপ আর সন্তাপরাশি করে দাও আজ শেষ।

কর আঁখি-শর বর্ষণ হৃদে, চপলেক্ষণা রাধা,
ক্ষত-বিক্ষত হইলেও তাহে দিব না কোনোই বাধা ;
কিম্বা বাঁধিয়া ভুজবন্ধনে চিরদিন রাখ মোরে—
পলাবে না কভু কৃষ্ণ-হরিণ বাগুরা ছিন্ন করে।

যাহে তব সুখ, দাও সেই দুখ, হে, চারু-চন্দ্রাননে,
তোমার আদেশ পালিবে এ দাস অতি প্রসন্ন মনে।
তুমি আভরণ, তুমিই জীবন, তুমি অমূল্য নিধি—
সুধার সাগর ছানিয়া আমারে দিয়াছে দয়াল বিধি।

তব সন্তোষে মোর সন্তোষ, তব সুখে আমি সুখী—
তপ কৃপা বিনা অন্য কিছুই চাহি না, চন্দ্রমুখি।
সুন্দরি, তব লোচনযুগল নীল নলিনীর মত,
এবে ক্রোধাবেশে কোকনদরূপে হইয়াছে পরিণত।

কৃষ্ণ-মৃগেরে যদি সন্ধান কর এই কাম-শরে,
হয় অনুরূপ কার্য্য তবেই, সখি, এই অবসরে।
সুশোভিত কর মণিময় হার কুচ-মঙ্গলঘটে,
মুখর "রসনা" মিলন ঘোষণা করুক জঘনতটে।

স্থলপদ্মেরে করিছে নিন্দা তব পদতল দুটি—
সাধ হয় মনে, আমি অনুদিন ও দুটি চরণে লুটি।
দাও এ আদেশ, হৃদয়েশ্বরি, দীন কিঙ্করে তব,
যাবক রচনা করি ও' চরণে লভি সুখ অভিনব।

রাখ মোর শিরে পদপল্লব স্মরের গরল নাশি,
শিরোভূষা মোর দেখুক আসিয়া নিখিল বিশ্ববাসী।
ইহা বলি হরি প্রসারিত করে চাহে শ্রীচরণ দুটি।
সোনার কমল-নিকটে সুনীল কমল উঠিল ফুটি।

"দাও ও উদার পদপল্লব"—কহে হরি বার বার—
বিস্মিতা হয়ে হেরিছে ভারতী সে ছবি চমৎকার।
মধু-উৎসবে সমাগতা যত রাধা-সঙ্গিনীগণ,
অলিবান্ধবীসম অলিন্দে করিছে গুঞ্জরণ।

"দেহি পদপল্লবমুদারম্"

দেখি এ চিত্র, কবির চিত্ত সন্দেহ-বায়ু-দোলে
শৈলশিখর হইতে পড়িল যেন জলধির কোলে।
'বুঝি ঘুমঘোরে দেখেছি স্বপন'—এ কথা ভাবিতে মনে,
যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিল নিদাঘতপ্ত বনে।

লীলা-সুধানদী গেল দূরে চলে, সন্তাপ-বালুরাশি
সন্দেহ-ঝড়ে উড়ি শরসম বিঁধিল মর্ম্মে আসি।
জগন্নিবাস, তাঁর এ প্রয়াস আনে রসাভাস প্রাণে,
খণ্ডিতা রাধা, তার পায়ে সাধা, বাধা দেয় যেন গানে।

বিশ্বকর্ত্তা চরণপ্রয়াসী গোপললনার পাশে—
এ ছবি আঁকিতে নারে কবিবর, শঙ্কা জুলিয়া আসে।
নবমুকুলিতা আশালতা যেন ছিন্না হইয়া লুটে,
সুরতি বিহনে ভারতীর বীণে সুরালাপ নাহি ফুটে।

ছিন্নতন্ত্রী দেখিয়া যন্ত্রী "কচ্ছপী" দিল ফেলি,
সংশয়ে দেখি অন্তর্হিত হল সব রসকেলি।
ভক্তির পথে সংশয়লেশ সাধনের ঘোর অরি।
আজ তারই বশে কবি যায় ভেসে হারায়ে কাব্য-তরী।

কবি ব্যথাহত উদ্বেলচিত সন্দেহ-তাড়নায়—
সাগরের জল হইল উতল যেন ঘোর ঝটিকায়।
গেল ভাব ভেসে কোন্ দূর দেশে, আর নাহি বসে মন:
দেখে কেন্দুলি গ্রাম আপনার, এ নহে বৃন্দাবন।

অস্থিরচিতে রাখে এক ভিতে পুঁথি ও লেখনী তুলি,
ছবি আঁকা তাঁর হইল না আর দেখি রংহীন তূলী।
সন্দেহ আসি দিল ভাব নাশি, ভঙ্গ দেখিয়া পদে
বাণী গেল চলে বেদনায় দলে কবি-হৃদি-কোকনদে।

সন্দেহ-বায়ে মানস দোলায় উঠে পড়ে বার বার,
ভাবে, 'এই ছবি আঁকিবে কি কবি লয়ে দাস-অধিকার
প্রভুর শিরেতে নারীর চরণ ভৃত্য কি দিতে পারে!
অতএব যাই, লয়ে কাজ নাই এই দায়িত্বভারে।

হইয়াছে বেলা, যাই এই বেলা স্নান সমাপন করে
হলে লঘু প্রাণ, শাস্ত্রপ্রমাণ দেখিব আসিয়া ঘরে।
ভাবি কবিরায় উঠিয়া দাঁড়ায়, ডাকে, "ও, পদ্মা" বলি,
সস্মিতাননা আসে সুলোচনা স্বামীর নিকটে চলি।

কবি কহে, "প্রিয়ে, থাক তুমি গৃহে, আমি যাই স্নান তরে,
আসিয়া পূজিব দেবতায়, তুমি রেখ আয়োজন করে।"
বলি, কবি যান করিবারে স্নান স্নিগ্ধা গঙ্গাজলে;
পূতা ভাগিরথী-পরশনে যদি যায় মনোব্যথা চলে।

গৃহে একাকিনী রহে পদ্মিনী পতিধর্ম্মেরে সেবি,
করে গৃহকাজ দুখানি হস্তে, যেন দশভুজা দেবী।
হাতে রাঙা শাঁখা মমতায় আঁকা, বদনে প্রসন্নতা;
সাড়ী লালপেড়ে, কেশ জানু ছেড়ে জানায় অবাধ্যতা।

সিঁথায় সিঁদুর, মধুর মধুর, হাস্য রঙ্গাধরে,
দ্রাক্ষালতার মত তনুখানি লীলায়িত প্রেমভরে,
অঙ্গেতে নাই আভরণ শাঁখা-লৌহবলয় বিনা,
বঙ্গবধূর বেশে ইন্দিরা, দেখে তবু যায় চিনা।

ইন্দীবরের মত দুটি আঁখি ঢালে প্রাণে শীতলতা,
আঁখির ভাষায় সব বোঝা যায়, না বলিতে কোন কথা।
জয়দেবকবি-গৃহে এই দেবী যেন গো, কবিতারাণী।
নারীরূপ ধরি দেহখানি ভরি এঁকেছে আশার বাণী।

এই কবিজায়া পাইয়াছে কায়া মানসী মানুষী-বেশে—
হয়ে যাদুকরী করে কারিগরি গৃহ-অঙ্গনে এসে।
কিবা পরিপাটী আঙিনার মাটী, গোময়ে লিপ্ত শুচি,
পর্ণকুটীর স্নিগ্ধ রুচির—যতনে রেখেছে মুছি।

গাছে গাছে বেলা মল্লী করবী ফুটিয়া সোহাগ মাগে,
তুলসীকানন করি সুশোভন রাখিয়াছে পুরোভাগে।
যত্নে রোপিত কদলীশ্রেণীতে ধরেছে কলার কাঁদী,
জলনালী কাটি অতি পরিপাটি, দেছে আলবাল বাঁধি

বেগুন কুমড়া লাউ ডাঁটা শাক শ্যামলে সবুজে ভরা—
সব আশাময়, দেখে মনে হয়, লক্ষ্মী দিয়েছে ধরা!
চালে চালে দেছে তুলি লতাজাল মঞ্চ বাঁধিয়া দ্বারে,
লতামণ্ডপ ভাঙ্গিয়া পড়িছে সুরভিত ফুলভারে।

যন্ত্রচালিত যেন দুটি কর, করে কাজ খুঁটিনাটি—
রন্ধনঘরে আপনার করে করে পাক পরিপাটী;
অনুরাগ-রসে ব্যঞ্জন রসে সুবাসে মাতায় গেহ,
অন্নের থালি পুষ্পের ডালি বলি হয় সন্দেহ।

বাণীর সাধক 'পদ্মা'-নায়ক, যেন সাধনার বলে,
পেয়েছে পদ্মালয়ার অংশে পদ্মারূপিণী ফলে।
অবসাদহীনা সস্মিতাননা, করে কাজ একমনে—
হেনকালে কবি অস্নাত হ'য়ে ফিরে এল অঙ্গনে।

পদ্মা চমকি কহে, "নাথ, একি! অস্নাত ফিরে এলে?
কিছু কি ভুলিয়া গিয়াছ ফেলিয়া—পুষ্প তুলসীদলে?
কিম্বা সহসা হলে অসুস্থ?—শীঘ্র প্রকাশি কহ।"
হাসি কহে কবি, "পূর্ণসুস্থ আছে, প্রিয়ে, মোর দেহ।

মাত্র কবিতা একটি চরণ স্মরণ হইল পথে,
পাছে ভুলে যাই, আসিলাম তাই কিছুদূর পথ হতে।
দাও পুঁথিখানি, লিখে পদখানি গৃহেই করিব স্নান,
তারপর পূজা ইষ্টদেবেরে, করিব ভোজন-পান।"

পদ্মা হাসিয়া আনি দিল পুঁথি, লেখনী, মস্যাধার,
বলে, "নাথ, এবে কবিতার ভয়ে গৃহে থাকা হল ভার।
শয়নে স্বপনে থাক তার ধ্যানে, ভোজনে স্নানেও বাধা,
একি কুহকিনী মন্ত্রের জালে লাগায়েছে এই ধাঁধা।

এই যাদুকরী মোর ধন চুরি করিতে এসেছে বুঝি।"
কবি হাসি কহে, "ভয় নাই, প্রিয়ে, হারালে আনিব খুঁজি।
প্রতিবিম্ব হেরে বৃথা কর ভয় মুকুর সমুখে রাখি।
সে ত ছায়া শুধু, তুমি যে স্বরূপ, এখনো বুঝিতে বাকী।

এ হৃদি-আলেখ্য, তার মাঝে তুমি, বাহিরেও তার তুমি,
ধরি নানা রূপ বিভাবিত কর আমার হৃদয়-ভূমি।"
সলাজ হাসিয়া সস্মিতাননা রন্ধনশালে গেল ;
পুঁথি খুলি কবি আঁকে প্রেমছবি বিচিত্র নিরমল।

ছন্দে পূরিয়া উঠে জয়দেব—গ্রন্থ রাখিয়া, পরে
করি স্নান পরি ধৌত বসন যায় উপাসনা তরে।
নানা উপায়ন করি আয়োজন সময় জানিয়া বালা,
দেবতার ঘরে যায় ত্বরা করে সাজায়ে ভোগের থালা।

দুয়ারে পশিয়া বিস্মিতা সতী, চাহিয়া পতির পানে,
মূর্ত্ত হইয়া যেন চন্দ্রমা বসেছে বিভুর ধ্যানে।
একি অপরূপ রূপ-লাবণ্য ছুটিছে কবির দেহে—
দেখি সেই আলা স্তম্ভিতা বালা, পশিল না আর গেহে।

ভাবে সেই সতী, একি তার গতি! কিছুই বুঝিতে নারে,
চকোরীর প্রায় পিয়ে রূপ-সুধা দাঁড়ায়ে গৃহের দ্বারে—
অচলা হইল লীলাচঞ্চলা সেই বরাঙ্গী রামা,
অন্নদাত্রী যেন এ মূর্ত্তি—মূর্ত্তা হরের বামা।

করি যোগাসন মুদিয়া নয়ন বসিয়াছে দ্বিজরাজ ;
ধ্যানধারণায় ধরা নাহি যায় যে ভাব ধরেছে আজ।
ধ্যেয় করে ধ্যান, নাহি হেন জ্ঞান, যে জ্ঞানে সে জ্ঞান আসে।
স্বরূপ অরূপে সমাহিত যেন, অরূপ স্বরূপে ভাসে।

করে অনুভব নিজেরেই নিজে করি যেন কোলাকুলি ;
দাঁড়াইয়া সতী দেখে এ বিভূতি বাহ্যচেতনা ভুলি।
আত্মারামেরে হেরিছে পদ্মা হইয়া আত্মহারা—
হৃদয়-সিন্ধু উথলি বহিছে নয়নে অশ্রুধারা ;

বিপুল হর্ষে পুলকাঞ্চিত হইয়াছে তনুখানি
যেন সমাহিত শিবে দরশন করিতেছে সতীরাণী।
করি সংযত বিভূতি তখন উঠে কবিবর জাগি,
পূর্ব্বের মত ধরে নিজরূপ—বৈষ্ণব অনুরাগী।

দণ্ড-আকার পড়ে বার বার দেবতার পদতলে,
স্তুতি ও মিনতি করি নারায়ণে মর্ম্মের কথা বলে ;
পরে চাহি ফিরে, দেখে পদ্মারে অন্নপাত্র লয়ে,
অন্নদাসম রয়েছে দাঁড়ায়ে অতি বিস্মিত হয়ে,

কবি কহে হাসি, "অদ্ভুত, প্রিয়ে, একি রূপ অভিনব।
কোন্ অমৃতসাগরে মগ্ন হয়েছে হৃদয় তব ?
সমাহিত মন, কারে দরশন করিতেছ ঐরূপে ?
সচলা হইয়া হয়েছ অচলা ডুবি কোন্ রসকূপে ?

চিত্তবৃত্তি করিতে নিরোধ কত শ্রম আমি করি—
অন্তর্মুখ হইলে, বাহ্যচেতনাটি যায় সরি।
চেতনানন্দ পাই না কখনো জড়সমাধিতে মম ;
সুষুপ্তি শুধু দেয় সুতৃপ্তি সুখনিদ্রার সম।

আমি করি ধ্যান নিমীলিত আঁখে, তুমি কর আঁখি মেলে,
কষ্টসাধ্য আমার যা কিছু, তুমি পাও অবহেলে।
তুমি অনুরাগে পাও যেই ভোগ, মোর ভাগ্যে তা নাই,
যম প্রাণায়াম নিয়মাদি করে যম-যন্ত্রণা পাই।

শিখাও তোমার পাতিব্রত্য আমারে সদয়া হয়ে,
পুরুষাভিমান বিষের ভাণ্ড কাজ নাই শিরে বয়ে।
মোর গৃহদেবী হয়ে তুমি, দেবি, ধন্য করেছ মোরে,
তব গৌরবে 'জয়দেব' নাম রহিবে জগৎ ভরে।"

শুনি এই বাণী, স্মিতমুখখানি আনত করিয়া লাজে,
ভোগের দ্রব্য দিয়া যায় সতী অন্য গৃহের কাজে।
নারায়ণে ভোগ করে নিবেদন ব্রাহ্মণ যথাবিধি ;
প্রেমিকের রূপ ধরি উপাসনা করে আজ প্রেমনিধি।

শয়নাদি দিয়া নারায়ণে, কবি ডাকি বলে, "ওগো, প্রিয়ে,
রাখ এইবার ক্ষুধিতের প্রাণ প্রসাদী অন্ন দিয়ে।
অগ্নিরে সেবি দ্বিজগণ লোভী হইয়াছে এই ভবে ;
অন্নগন্ধ পেলেই সেহেতু ক্ষিপ্তের দশা লভে।

জঠরের জ্বালা মিটাও দুবেলা, সেহেতু কবিতা আসে ;
হত কল্পনা বৃথা কল্পনা তুমি না থাকিলে পাশে।
শুনি রহস্য, মধুর হাস্য হাসিয়া পদ্মাবতী,
পরশিয়া দেন প্রসাদী অন্ন যতন করিয়া অতি।

বসি সুখাসনে, করি আচমন, ব্রাহ্মণ মনোসুখে
নানা ব্যঞ্জন আস্বাদি করে প্রশংসা শতমুখে—
"অমৃত পাক করেছ, পদ্মে,"—বলে, বার বার কবি ;
ভোজনানন্দে উজ্জ্বল দেখি পতির মুখচ্ছবি,

পরমানন্দ লভি পদ্মিনী অদূরে বসিল ধীরে,
স্থলপদ্মের মত করতলে সু-তালবৃন্ত ফিরে—
ভোজনের শ্রম করেন হরণ যেন মায়াদেবী এসে,
সে সেবা গ্রহণ করেন শ্রীহরি আজি মায়াবীর বেশে।

ভোজন-অন্তে আচমন করি, তাম্বুল-বীটি নিয়ে,
শয়ন করেন জয়দেব কবি শয়নকক্ষে গিয়ে—
পদতলে বসি পতির চরণ অঙ্কে ধরিয়া সতী,
সুখ-পরশনে হইলেন আজি অতি বিস্মিতমতি।

যেন কোটি কোটি স্নিগ্ধ তড়িৎ প্রবাহিত হল দেহে,
শিথিলহস্তে করে পদসেবা অভূতপূর্ব্ব স্নেহে।
চরণে চিহ্ন দেখি কহে, "নাথ, একি দেখি পদে লেখা ?"
কবি কহে, "উহা কিছু নয়, কুশ-কঙ্কর-ক্ষত-রেখা।"

ইহা বলি বলে, "যাও, পদ্মিনী, করিও না আর দেরী
ক্লিষ্ট হতেছে হৃদয় আমার তব ম্লানমুখ হেরি।
হইয়াছে বেলা, যাও এই বেলা, ভোজন সমাধা হলে,
সুস্থচিত্তে আমার নিকট আবার আসিও চলে।"

বলিয়া চরণ নিল সরাইয়া, তখন পদ্মাবতী
বিহ্বলাপ্রায় উঠিয়া দাঁড়ায় চরণে করিয়া নতি।
সুধাহ্রদ ত্যজি যায় যেন মীন—এমনি ব্যাকুল হিয়া,
গিয়া বসে পতিভুক্তাবশেষ প্রসাদ-অন্ন নিয়া—

বসি একগ্রাস প্রসাদ তুলিয়া যেমনি দিয়াছে মুখে,
সুধার সুতারে সুখের তুফান তুলিল সতীর বুকে।
অন্নের মাঝে তড়িৎ-প্রবাহ বহে অমৃত-স্বাদে,
বিহ্বলাপ্রায় বসিয়া তথায় পদ্মা হাসে ও কাঁদে—

সেই অবসরে, কবি এল ঘরে গঙ্গাস্নান করি,
মুখে রটে নাম "কৃষ্ণ" ও "রাম" প্রেম-উচ্ছ্বাসে ভরি।
অঙ্গনে আসি, বিস্মিত কবি চাহি পদ্মার পানে—
ভোজননিরতা পত্নীরে দেখি ক্ষান্ত হইল গানে।

পাগলিনীপ্রায় দেখিয়া তাহায়, বলে "ও, পদ্মাবতি,
দেবতার আগে করিছ ভোজন, রাখি অভুক্ত পতি!"
স্তম্ভিতা বালা উঠিল দাঁড়ায়ে, বলে, "একি পরিহাস!
তুমি শুয়ে ছিলে—কোথা হতে এলে পরিয়া স্নানের বাস?

কোন্ পথ দিয়া গেলে বাহিরিয়া কিছুই ত নাহি জানি,
ভোজনের তরে পাঠায়ে এখন কহ বিপরীত বাণী!"
কহে কবিবর, "আমি ত' প্রভাতে গিয়াছি স্নানের তরে,
গঙ্গাস্নান সারিয়া এখনি ফিরিয়া এলাম ঘরে।

বাতুলার প্রায় কহ কি কাহায়, কেবা শুয়েছিল আসি ?"
"তুমি বিনা আর কে শুইবে ঘরে !"—কহিল পদ্মা হাসি।
মহাসমস্যা হইল কবির, নারীরে বুঝাতে নারে,
নানান্ প্রকারে নিজ সত্যতা প্রমাণ করিয়া হারে।

ভাবে দ্বিজ,— নারী ক্ষিপ্তা হইলে হ'ত সমস্যা সোজা,
ভূতগ্রস্তা হলেও মিলিত সহজেই কোনো ওঝা ;
কিন্তু আমায় বুঝায় পদ্মা নিজ সুশীলতা দিয়া,—
নহে সে পাগল, অথবা হয়নি ভৌতিক কোনো ক্রিয়া !

কখন মিথ্যা বলে না, সদা এ সংযতবাচা নারী
অথচ ইহার আচরণ আজ আনে সন্দেহ ভারি।
স্তব্ধ হইয়া ভাবে কবিবর,—দেখিয়া পদ্মাবতী,
বলে, "স্নানহেতু গিয়েছিলে তুমি, সত্যই, প্রাণপতি ;

কিন্তু একটি শ্লোকের চরণ পূর্ণ করিবে বলে,
কিছুদূর গিয়া, তখনি ফিরিয়া গৃহেতে আসিলে চলে।
গৃহে আসি পদ করিয়া পূরণ, স্নান পূজা আদি করে,
করিয়া ভোজন, করিলে শয়ন সুখে পালঙ্কোপরে।

বসিয়া ছিলাম তোমার চরণ-কমল লইয়া বুকে—
পাঠালে তুমিই ভোজনের তরে হরি সেই সেবাসুখে।"
চমকিত হন ব্রাহ্মণ শুনি শ্লোক-পূরণের কথা,
অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে প্রাণে জাগে ঘোর ব্যাকুলতা।

সংশয়ে পড়ি যে পাদপূরণ করেনি এখনো কবি,
ভাসিয়া উঠিল হৃদয়পটেতে সে উজল প্রেমছবি।
বলে জয়দেব—"আন দেখি প্রিয়ে, সত্বর পুঁথিখানি,
উৎকণ্ঠিত হতেছে হৃদয় শুনি অদ্ভুত বাণী।

পতির আদেশ শুনিয়া সাধ্বী ধৌত করিয়া কর,
আনিল গ্রন্থ, দেখে খুলি তাহা জয়দেব কবিবর;
দেখে, বিচিত্র চিত্রের মত সুলিখিত পদখানি—
"দেহি পদপল্লবমুদারম্"—লেখা অলিখিত বাণী।

ভাবে কবি মনে, 'যা ছিল গোপনে, অন্যে জানে না কেহ,
অন্তর্য্যামী বিনা তাহা কেবা লিখিল ধরিয়া দেহ।
আর কেহ নয়, সেই দয়াময়, সেই ব্যথাহারী হরি
প্রেমের তত্ত্ব বুঝাইয়া গেছে নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরি।'

'যোগ' আর 'ক্ষেম' করে সে বহন হলে অনন্যমতি,
নিত্যযুক্ত জনের অভাব সহে না কমলাপতি।
নহে পরোক্ষে, সাক্ষাতে আসি করে সে করুণা দাসে,
মহান্ হয়েও, অণু হতে অণু সাজিয়া নিকটে আসে।

"বহাম্যহম্" বাক্য, গীতায় যাহা করিয়াছে দান,
সেই প্রতিজ্ঞা রাখিয়াছে আজ ভক্তের ভগবান্।
আমার অভাব করিল পূরণ ছদ্মমূরতি ধরি;
এমনি বাঞ্ছাকল্পপাদপ সেই রসময় হরি।

ইহা ভাবি প্রভু-হস্ত-লিখিত গ্রন্থ শিরেতে ধরে,
নয়ন-কমল হইতে কবির দরদর ধারা ঝরে।
পদ্মারে কহে—"সে ত' নর নহে, সেবিয়াছ তুমি যাঁরে
হয়ে তব নাথ, শ্রীজগন্নাথ এসেছিল তব দ্বারে।

আমার ন্যূনতা তোমার পুণ্যে করে গেছে প্রভু দূর—
শ্রীপাদপদ্ম-পরশনে পূত করি "কেন্দুলি" পুর।
চাক্ষুষ তাঁরে পতিরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছ দেবি,
আমি বঞ্চিত হইলাম শুধ্ পুরুষাভিমানে সেবি।

শ্রীরাধাতত্ত্ব অনধিগম্য ছিল এতদিন মোর,
কেটে গেল আজ জ্ঞান-অন্ধের নয়নের ঘন ঘোর।
শব্দে অর্থ যোগের মতন কৃষ্ণে যুক্তা রাধা ;
নিজেই নিজেরে আস্বাদে হরি ধরিয়া স্বরূপ আধা।

গেছে অন্ধতা, যাব এবে আমি সেই প্রেমময়ীপাশে,
করি কিঙ্করী কৃষ্ণেতে রতি দেন যদি দীন দাসে।
হয়ে সঙ্গিনী, চল, পদ্মিনী, মধুময় ব্রজধামে ;
তব সুসঙ্গে হইলে শুদ্ধ, পাইব শ্রীরাধা-শ্যামে।

স্পর্শমণির পরশনে পায় লৌহ স্বর্ণ-গতি,
সতের সঙ্গে কাক হয় পিক, ক্রৌঞ্চ হংসপতি।
মন্ত্রৌষধি কি শিখেছ তুমি, আমারে শিখাও তাহা—
মায়াপতি হরি, তাঁরে বশ করি ধরিয়া আনিল যাহা।

কৃষ্ণের প্রিয়া, অতি মাননীয়া আজ হতে হলে তুমি,
হয়ে অনুদাস থাকি তব পাশ সেবিব চরণ চুমি।
পুরুষাভিমানী জনে ভগবান্ দূর হতে কৃপা করে ;
পায় না ব্রজেশে সে মধুররসে যে না নারীভাব ধরে।
পতিধর্ম্মেতে সুস্থিতা তুমি, পেয়েছ শ্রীপতি-পতি ;
শিখাও তোমার ধর্ম্ম এ দাসে, দিয়া তব-সম মতি।
ওগো, যাই যাই, আর কাজ নাই গৃহ-কারাগার-বাসে,
যাব সেথা, যেথা রাধিকাবন্ধু বাঁধা সদা প্রেম-পাশে—
যেথা তরুলতা নত করি মাথা চাহে গোপী-পদ ধূলি,
কলিকিঙ্কর করে না ভ্রমণ যেখানে পতাকা তুলি।”
ইহা বলি, ধায় বাতুলের প্রায় জয়দেব মহামতি,
পাছে পড়ে যায়, এই ভয়ে ধায় পিছনে পদ্মাবতী।

বিরহী জয়দেব

শয়নকক্ষে করিয়া প্রবেশ, দেখে কেহ নাই তথা,
পড়ে আছে শুধু পীতবাসখানি প্রকাশি মনের ব্যথা।
করিয়া যতন কাঙ্গালের ধনসম শিরে নিল তুলে,
বুকে ধরি তায়, কাঁদে কবিরায় শিশুসম ফুলে ফুলে।
বলে, “ওগো প্রিয়, দিও দাসে দিও এইরূপে তব সাড়া ;
নাই হেন বল, চরণ-কমল দেখি এ চিহ্ন ছাড়া।
এও তবু ভালো, ঢাল প্রভু, আলো, এইভাবে পথে মোর ;
আছ কোলে করি, যেন না পাসরি মায়ায় হইয়া ভোর।

অন্তর্য্যামী, দাওনি যে তব দর্শনে অধিকার,
কার্পণ্য দোষ-দুষ্ট এ আঁখি হয়নি যোগ্য তার।
এখনো নয়ন চকোরের সম হয়নি পিয়াসী মম,
একাগ্রতায় হয়নি হৃদয় এখনো চাতকসম।

পাতিব্রত্য শিখিনি এখনো পদ্মাবতীর ম•,
নলিনীর মত হইনি সূর্য্যকিরণের অনুগত।
এখনো শ্রবণ রয়েছে, বধির—তোমার বংশীধ্বনি,
শুনি নাই, হরে, তাই দেহ ধরে আছি হে চিন্তামণি।

তাই গেলে চলে—লঘুদাস বলে দিয়ে গেছ কিছু সাড়া;
কিন্তু তোমার বিয়োগ যে প্রভো, যম-যাতনার বাড়া।
আর কতদিন রব গো, তোমার ঘট-পট-পানে চেয়ে,
কবে দিবে দেখা, হে ব্রজের সখা, অকূল খেয়ার নেয়ে।

তোমার চিত্রে চিত্ত নিবেশি কতদিন চেয়ে আছি—
কখন আঁখির ইঙ্গিত পাব, এই আশা লয়ে বাঁচি।
এসে চলে গেলে, আঁখির পিপাসা মিটালে না ওহে, হরি,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস দিয়ে দিলে না জীবন ভরি।

শুধু বাস, শুধু অঙ্গের বাস দিয়ে গেছ দাসে কিছু,
দেহ ছাড়ি প্রাণ করিতে প্রয়াণ চাহে তার পিছু পিছু।"
বলি, বাস লয়ে সুবাস গ্রহণ করি শ্বাসে শ্বাসে কবি,
হয়ে মূর্চ্ছিত পড়িল ধরায় তদগতভাব লভি।

স্তিমিতনয়ন পতিত পতিরে ধেয়ে নিল সতী কোলে,
করি হায় হায় লুটায় ধূলায়, "কি হল, কি হল" বলে।
সংজ্ঞার আশে বিবিধ প্রয়াস করে পতিব্রতা সতী,
বলে "কোথা আছ, রাখ" হে, জীবন, পতির, কমলাপতি।"

বাহ্যচেতনা হারায়ে এখন অন্তর্মুখ কবি
দেখেন তাঁহার চির-আরাধ্য বৃন্দাবনের ছবি।
যমুনার তীর, সুনীল সুথির জলে কালিন্দী ভরা
যেন শ্যামতায় শ্যামে অনুভব করায় বসুন্ধরা।

গাভী পিয়ে বারি, কেহ বা সাঁতারি যায় যমুনার কূলে,
তিমিরপুঞ্জ নীপ-নিকুঞ্জ যায়নি এখনো ভুলে ;
গোষ্ঠের বেলা, রবিকর-জ্বালা হয়নি প্রখর অতি,
যমুনার জলে ঝিকিমিকি চলে বিমানে করিয়া গতি।

শীতল সমীর যেন শান্তির কাহিনী বেড়ায় গেয়ে,
চারণের প্রায় ফুলে ফুলে যায়, পথে ও অপথে ধেয়ে ;
প্রবল-বিরহ-অনল-দগ্ধ মূর্চ্ছিত কবি-চিত—
পরশিয়া স্নায়ু, ব্রজের সে বায়ু করিল সঞ্জীবিত।

বিস্মিতচিতে চাহে চারিভিতে সমাধিমগ্ন কবি,
ভাবে, 'সত্বর আসিয়াছি ব্রজে প্রখর না হতে রবি—
কান পাতি শুনে, কে যেন গাহিছে গীতগোবিন্দ-গান—
অতি সুস্বরে শিখায় অপরে, হয় হেন অনুমান।

আসে রসসুর মধুর মধুর সুধার প্রবাহ লয়ে,
"মুঞ্চ মুঞ্চ" শব্দ, শ্রবণে যায় প্রসঙ্গ কয়ে ;
লক্ষ্য করিয়া দূরাগত স্বর ভাবুক চলিল ধেয়ে,
দুলে ফুলে ফুলে চলকুন্তল স্কন্ধযুগল ছেয়ে ;

আয়ত সে আঁখি চাহে আঁকি বাঁকি, কাহারে খুঁজিছে যেন—
কেন গো, তরুণ এ নববয়সে পাগল হয়েছে হেন ?
পাগ্‌লা ভোলায় যে জন মাতায় শ্মশানে মশানে টানি,
ক্ষিপ্ত নারদ 'মহতী' বীণায় গায় যাঁর মধুবাণী।

ছাড়ি গৃহদ্বার, দক্ষকুমার উন্মাদ হল সবে,
সনকাদি মুনি যাঁর গুণ গুণি চিরযোগীত্ব লভে।
ব্রজযুবতীর ধৈরজনাশী সে বেণুবদন বুঝি,
করেছে পাগল জয়দেবে আজ কেন্দুলিগ্রামে খুঁজি।

তাঁরি ছলনায় গেছে গো, ইঁহার গেহ কুলীনতা মায়া,
সতীশিরোমণি পদ্মার মত রূপসী প্রেয়সী জায়া ;
দেহের মমতা ছাড়িয়া এসেছে মানসবৃন্দাবনে,
দেখে নিরমল ছবি অবিকল লোকাতীত ব্রজবনে।

গিয়া কিছুদূর দেখে, কি মধুর দৃশ্য যমুনাকূলে—
তীরবাসী এক কেলিকদম্ব শাখা হেলাইয়া দুলে।
সেই নীপশাখে বাহুখানি রেখে, শ্যামসুন্দর হরি
শুকেরে শিখায় গীত-গোবিন্দ ছন্দে যতন করি,

করে আবৃত্তি শুক একবার, শারিকা সে সুর ধরে,
সে মধুছন্দ শুনে গোবিন্দ পরমানন্দভরে।
হাস্তে আস্ত হয়েছে উজল, আঁখিতে চটুল ভাষা,
পাগলে করিয়া উন্মাদ, দেয় শেষ বিরামের আশা।

চকিতে দৃশ্য হল অদৃশ্য, এদিকে জাগিল কবি,
পদ্মের মত পদ্মা বাঁচিল হেরিয়া কান্ত-রবি।
জেগে কবি বলে, "কোথা গেল চলে ? এই ত দাঁড়ায়ে ছিল !
না মিটিতে মোর আঁখির পিপাসা কে তারে ডাকিয়া নিল।

একি, আমি কোথা, এ কার বনিতা বসেছে শিয়রে আসি ?
কোথা কালিন্দী—ইন্দীবরের মত নীল জলরাশি ?
"মুঞ্চ মুঞ্চ" বলি শুক শারী কোন মালঞ্চে গেল ?
প্রভাতকিরণ সরায়ে ত্বরায় প্রখরতা কেন এল ?"

প্রলাপবাক্য শুনিয়া পতির, ব্যথিতা হইয়া বালা
বলে সান্ত্বনাবচন যেন গো, মধুস্নেহ-রসে ঢালা,
কহে, "নাথ, এ ত নহে ব্রজপুরী, এ যে কেন্দুলিপুর,
এখানে বাজে না শ্যামের মুরলী ছড়ায়ে মোহন সুর।

যদি যাবে সেথা, চল দুইজনে এখনি যাত্রা করি,
অতি সত্বর দেখিবে তথায় তোমার প্রাণের হরি।
কিন্তু অগ্রে করিয়া ভোজন তারপর চল স্বামী,
পথে কিঙ্করী হবে সহচরী সেবি পদ দিনযামি।"

শুনি সাধ্বীর শীতল বচন উঠিয়া বসিল কবি,
একে একে মনে জাগিতে লাগিল অতীতের সব ছবি।
পদ্মারে বলে, "সত্য, সরলে, ভ্রান্ত হয়েছি আমি,
দিবসে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ভাবিয়া প্রগাঢ় যামি।

ভোজনের কথা করালে স্মরণ আহা, সে অধর সুধা
আজি লাভ করি মিটাব পদ্মা, কোটি জনমের ক্ষুধা।
বিনা সে প্রসাদ, হয় সব স্বাদ বিস্বাদে পরিণত;
সেই অমৃত ত্যজিলে মৃত্যু দ্বারে হয় সমাগত।

কৃষ্ণ-প্রসাদ বিনা কেবা কবে পাইয়াছে ব্রজভূমি,
আজি হিতৈষীসম সেই কথা স্মরণ করালে তুমি।
তোমার কৃপায় তাঁর সাড়া আজ পেয়েছি, পদ্মাবতী,
তুমি সাথে গেলে, আমি অচিরাৎ পাব সেই ব্রজপতি।

তবাধীন প্রভু, যদি আসে কভু, আসিবে তোমারি কাছে,
সঙ্গের ফলে পাব দরশন থাকিয়া তোমার পাছে।
তবে চল যাই"—বলি, কবিরায় উঠিয়া দাঁড়ায় তথা,
চলে সহকারে সঙ্গে লইয়া সঞ্চারিণী সে লতা।

ব্রজাভিমুখে

হাসি-কান্নায় প্রসাদী অন্ন সেবা করি কোনোমতে,
কিছু সাথে নিয়া বাতুলের প্রায় চলিল ব্রজের পথে—
চাহিল না আর গৃহ-দ্বার-পানে তীব্রবিরাগবশে,
কৃষ্ণ-সুধায় মগ্ন কি কভু মজে বিষয়ের রসে।

যেন শুকদেব চলেছে অগ্রে, মায়ারে পিছন করি—
কৃষ্ণাসক্তি সাথে যায় তাঁর নারীবিগ্রহ ধরি।
হয় সমতল স্নেহে ধরাতল, পবন ব্যজন করে;
বুকে ঢাকি ধূলি, কঙ্করগুলি লুকাইল প্রেমভরে;

যেন নাহি বাজে, কাঁটা যায় নিজে সরিয়া পথের পাশে,
প্রস্তুত হল চর ও অচর ভক্তের সেবা-আসে।
পথ দেখাইয়া যায় সাথে নিয়া কে যেন ছায়ার মত,
তরু-লতাগুলি দুই পাশে তুলি চরণে রইল নত—

বাণী যায় সাথে পুলকিতগাতে ছন্দ ও সুর লয়ে,
ব্রজের মাধুরী আসে সঞ্চরি কবির চিত্তালয়ে।
খুলি পুঁথিখানি দেখে মধুবাণী প্রভুর হাতের রেখা—
"দেহি পদপল্লবমুদারম্"—প্রেমের চিত্র লেখা।

ভারতীর বীণে রাত্রে ও দিনে মিলনের সুর বাজে,
'বরাড়ী' 'বিভাস' 'রামকিরী' বুলে বাণী-নিকুঞ্জ-মাঝে।
আসে কত সুর, মধুর মধুর বঁধুর বারতা লয়ে—
'টোড়ী' 'ভৈরবী' 'সিন্ধু' ও 'কাফি' সমসঙ্গিনী হয়ে।

সন্ধ্যায় আসে 'পূরবী' আবেশে, নিশায় 'বেহাগ' বুলে,
বলে একই কথা, "আর নাই ব্যথা, রাই গেছে মান ভুলে।
নন্দকুমার মিলেছে আবার বৃষভানুসুতা-সনে,
শোক নাই আর, সে হেতু বিহার করিছে অশোকবনে।"

গীত-গোবিন্দে সে মধুছন্দ লিখে আর গায় কবি—
উড়ুগণসনে শশী রাতে শোনে, দিনে শ্রোতা হয় রবি।
একি গো রঙ্গ, জল-তরঙ্গ সুরে সুরে উঠে দুলে,
প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনিতে আছাড়িয়া পড়ে কূলে।

মিশিয়া হাওয়ায় পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায় বয়ে,
তড়িতের মত চকিত করিয়া অকথিত কথা কহে।
পিকের কণ্ঠে হয় ঝঙ্কৃত অনুকরণের সুরে,
যায় দিগন্তে ক্লান্ত চরণে দূর হতে অতি দূরে—

বুঝি ভারতীর বিজয়-কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হবে ভবে,
শুনায় সুরের তূর্য্যনিনাদ তাই এ জয়োৎসবে।
হাতছানি দিয়া কে যেন ডাকিয়া বলে, “আয় আয় আয়।”
আকাশে বাতাসে অনুভূতি আশে, কেহ পাশে পাশে যায়।

অজানা সঙ্গী করিয়া ভঙ্গী দেখায় অঙ্গখানি,
কখন চকিতে চলে যায় পথে মায়ার কুহেলি টানি।
ধরি ধরি করে ধরিতে না পারে, উন্মাদসম কবি
এধারে ওধারে আশে পাশে ঘোরে বৃন্দাবনের ছবি।

কভু যায় দেখা সেই বাঁকা সখা গোপশিশুগণসনে
খেলে যমুনায় কভু মাঠে ধায়, কভু নিকুঞ্জবনে।
খায় বসে দোল সুনীল নিচোল দুলায়ে ব্রজের বালা,
কেহ তুলে ফুল ভরিয়া দুকূল কেহ গাঁথে ফুলমালা—

দেখে কবিভূপ সে ছবি অনুপ, যেন ছায়াবাজি-মায়া,
শিথিল চরণে চলে আনমনে সাথে লয়ে সতী জায়া।
হইলে শ্রান্ত পদ্মা-কান্ত ঘুমায় তরুর তলে,
স্বপ্ন দেখিয়া "যাই যাই" বলে পুন পথে ছুটে চলে।

যখন যে ভাবে হেরে বিভাবিত পতিরে পদ্মাবতী
সেই ভাবে তাঁরে দেয় সান্ত্বনা অতি সযতনে সতী।
কত দিন রাত প্রিয়া লয়ে সাথ চলিল এরূপে কবি—
যেন ছায়াসাথে চলে বনপথে করুণ তরুণ রবি।

বৈষ্ণবমতি যেন রতিপতি যায় ব্রজ-অভিমুখে,
কাম-কামনার চিহ্ন এবার নাই আঁকা তার বুকে।
ফেলি শরধনু ভক্তের তনু ধরেছে রতির সনে,
প্রেম-সাধনায় কাম চলে যায় ব্রজের 'কাম্য' বনে।

ভক্তিসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসাইয়া অভিমান,
যেন জ্ঞান যায় গাহি উভরায় গীতগোবিন্দ-গান।
যেন গো, কর্ম্ম ত্যজি স্বধর্ম্ম, প্রজ্ঞায় লয়ে সাথে,
বিরাগ-মার্গে চলেছে লইয়া গীত-গোবিন্দ মাথে ;

প্রেমের মর্ম্ম বুঝাবে ব্রজের নর্ম্ম-আলিরা আসি,
বৈধী আচার করি পরিহার, যায় প্রেম-অভিলাষী।
পাতিব্রত্য শিখে পথে পথে পদ্মাবতীর কাছে,
এ পাঠের পর 'রাগানুগা' পাঠ গোপনে গোকুলে আছে।

শিখিবে কর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম মঞ্জরীগণ-পাশে,
যুগলসেবার আশা লয়ে তাই চলেছে কুঞ্জাবাসে।
গায় সুস্বরে গীত-গোবিন্দ "জয় জগদীশ হরে"—
পশু-পাখীসব হইয়া নীরব শুনে গান প্রেমভরে।

কভু হুঙ্কারে কভু ঝঙ্কারে প্রেমের আবেগে করি
পুলক কম্প স্বেদাদি অষ্ট সাত্ত্বিকদশা লভি।
আছাড়িয়া পড়ে পথের উপরে, পদ্মা আসিয়া ধরে,
সন্তর্পণে চেতনা আনিতে কতই যত্ন করে।

পতনোন্মুখ দেখিলে কখন বাহু মেলি ধরে বুকে,
আঁচল-বাতাসে শ্রম নাশি করে জলসিঞ্চন মুখে।
ঘর্ম্ম মুছায়ে মর্ম্মের ব্যথা নিতে চায় সদা হরি,
মধুস্নেহ যেন এসেছে ধরায় নারীর মূরতি ধরি।

রহে ছায়াপ্রায় ভোজন যোগায়, শুইলে চরণ সেবে,
নিজদেহস্মৃতি ভুলিয়া সাধ্বী সেবা করে পতিদেবে।
কভু যায় আগে, কভু যায় পাছে মত্ত পতিরে দেখে—
যেন মমতায় চলচ্চিত্র পথে কে গিয়েছে এঁকে।

ব্রজ দর্শন

ভস্মাবৃতা বহ্নির ন্যায় সেই ম্লানবেশা নারী
সতী গৌরব-রশ্মি ছড়ায়ে যায় তম অপসারি—
ব্রজের প্রান্তে আসি এইরূপে পহুঁছিল কবিবর,
দূর হতে করি প্রণাম, ধূলায় রঞ্জিল কলেবর।

এই ব্রজধূলি লয় শিরে তুলি সাদরে ভবানীপতি,
গুল্ম-জন্ম চাহিল ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিপতি।
শুক-সনকাদি-বন্দিত রজ রাজে এই ব্রজমাঝে,
কত যোগীন্দ্র কত মুনীন্দ্র তরুরূপে হেথা রাজে।

যমলাঞ্ছিত দেববাঞ্ছিত এই গোপীপদ ধূলি,
প্রেমাকর্ষণে স্বয়ং কৃষ্ণ যারে শিরে নিল তুলি ;
বিষয়-বিষয়ী-বর্জ্জিত এই অভিনব ধূলিকণা—
যাহারে মনন করে মনীষীরা হয়ে অনন্যমনা।

এ রজেতে নাই কামের গন্ধ, নাই কামনার জ্বালা,
ব্রজযুবতীর এযে আঁখি নীর সুস্থির প্রেমঢালা।
জমাট বেদনা, হয়ে ধূলিকণা পথে পথে আছে ছেয়ে
কিরূপে ইহাকে দেখিবে কামুকে কামনার চোখে চেয়ে।

কৌপীনসার ত্যজি সংসার যে আসে বৃন্দাবনে,
তারো পরিচয় কদাচিৎ হয় এই ব্রজরজসনে।
যে চেনে এ রজে, সে কি কভু মজে বিষয়-বিষের রসে,
কি কাজ তাহার ধনে বা ধান্যে, দশের মান্যে যশে।

স্পর্শমণিরে করে না পরশ এ রজের অধিকারী,
রজে নতশির হয়ে দিল্লীর সম্রাট গেছে হারি।
হেন ব্রজধূলি লয় মাথে তুলি দম্পতি নতশিরে,
বহু ধনসম করিয়া যতন বাঁধিয়া লইল চীরে।

বিস্ফারি আঁখি দেখে বিস্ময়ে ব্রজের বনানী-শোভা—
ফল-ফুল-লতা-বল্লরী-ক্রমে মুনিজনমনোলোভা।
জঙ্গম-দেহে করে তপস্যা ব্রজে আসি যোগীসবে,
হয়ে তরুলতা, রাধা-গোবিন্দ-লীলাসুখ অনুভবে।

লয় ব্রজধূলি অঙ্গেতে তুলি সবে নতশির হয়ে,
হরি-আলাপনে থাকে সুখীমনে ঝঞ্চা আতপ সয়ে;
বায়ু নাই তবু কাঁপিছে আপনি সাত্ত্বিক দশা লভি,
দিব্যনয়নে দেখেন সে সব ভাগ্যবন্ত কবি।

কৃষ্ণের সখা এইসব শাখী, রাধা-সখী লতাগুলি—
যুগলে যুগলে হরিকথা বলে আশ্রয় করি ধূলি।
আছে ডালে ফুলে পাতা বল্কলে "রাধা" ও "কৃষ্ণ" লেখা—
ভাগ্যে থাকিলে দরশন মিলে, অভাগায় দেখে রেখা।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত-পদ-চুম্বিত ব্রজে,
এখনো রয়েছে সেই পদাঙ্ক অঙ্কিত হয়ে রজে—
নির্ম্মল-আঁখে দেখেন সে সব, দাঁড়ায়ে ভক্ত কবি,
অতি সুখময় সুষমাভূষিত লীলাবিলসিত ছবি।

উথলি উঠিল হৃদয়-উৎস, নয়নে ফোয়ারা ছুটে,
অশ্রুসিক্ত কর্দ্দমাক্ত ভূমে প্রণমিয়া লুটে।
চলিতে চাহে না চরণ, শিথিল হইল অঙ্গগুলি
দেখি পথে পথে কৃষ্ণচরণ-চিহ্নিত ব্রজধূলি।

একি সঙ্কট হইল কবির, হল না ব্রজেতে যাওয়া,
হায়, কাণ্ডারী, তুমি বিনা ভার হল তার তরী-বাওয়া।
কে দিবে বলিয়া, কিরূপে প্রবেশ করিবে সে ব্রজপথে ;
প্রভু-পদাঙ্ক উপরে চরণ দিতে নারে কোনোমতে।

পাগলের প্রায় ইতিউতি চায় যেন আশ্রয় খুঁজি,
বলে "ভগবন্, তব দরশন পেল না অভাগা বুঝি।
আজি যে দ্বন্দ্ব জাগে মোর প্রাণে, কর যদি সমাধান,
তবেই বাঁচিব, নতুবা ত্যজিব এখনি এ ছার প্রাণ।

এসেছে পাতকী তোমার দুয়ারে, শোন প্রেমময়ী রাধে,
রজের প্রাচীর লঙ্ঘিতে নারে, তাই দাঁড়াইয়া কাঁদে—
শোনো দয়াময়ি, দীনের আর্ত্তি দয়িতের সনে আসি,
কর কিঙ্করে কিঞ্চিৎ কৃপা আঁখির পিপাসা নাশি।

"দাও দরশন, দাও দরশন"—বলি কবিবর কাঁদে,
"কোথা বনমালী পিচ্ছমৌলী ; কোথা রসময়ী রাধে।"
বলিতে বলিতে দেখিল অদূরে কদমখণ্ডী-শোভা,
শত কদম্ববৃক্ষে শোভিত, মনসিজ-মনলোভা।

মাঝে জলাশয় হ্রদের আকার, হৃদয়ে পদ্ম আঁকা,
গেছে দূরে চলে—কোথাও সরল, কোথাও বা কিছু বাঁকা।
আশে পাশে ঝাউ, বন্যকুসুম ভূমিতলে আছে ফুটে,
আসিয়া সমীর ঝির ঝির ঝির লতা পাতা ফুলে লুটে।

জলাশয়মাঝে বাজে এক দৃঢ় স্ফুট-কদম্বতরু,
শ্যামল শোভায় জুড়াইয়া যায় জীবের জীবন-মরু।
সেই তরুতলে সহসা দৃশ্য দেখে বিস্মিত কবি—
রাধা-সরোজিনীসহ বিরাজিত শ্রীরাধারমণ-রবি।

দোঁহে পাশাপাশি করুণায় ভাসি চাহিছে কবির পানে,
যেন গো, লৌহে অয়স্কান্ত সবলে নিকটে টানে।
ছুটে চলে যায় ভাবুক তথায় ভুলিয়া সকল কথা,
প্রাণপতিসনে ধায় পাছে পাছে পদ্মা পতিব্রতা—

ব্রজের পথেতে করিল প্রবেশ সাধ্বীর সনে কবি,
কিছুদূর গিয়া দেখে অদৃশ্য হয়েছে যুগলছবি।
"হায় কি হইল"—বলি মূর্চ্ছিত হইল ধূলার 'পরে,
পতির এ দশা দেখিয়া সতীর নয়নে অশ্রু ঝরে।

রবিখরতর, রৌদ্র প্রখর, হয়েছে দুপুর বেলা,
দেব-মন্দিরে দেবতা শুয়েছে, নাই দর্শন-মেলা ;
এ হেন সময় কাঁদিছে পদ্মা পতিরে অঙ্কে ধরি—
পথিকে শুধায় কেহ বা হেলায়, কেহ বা মিষ্ট করি।

সৌম্যমূর্ত্তি বৈষ্ণব এক যান সেই পথ দিয়া,
সতীর করুণ ক্রন্দন শুনি গলিল তাঁহার হিয়া।
কারণ জানিয়া করুণনয়নে চাহিয়া কবির পানে,
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ফুকারি কর্ণে দেহেতে চেতনা আনে।

স্বপ্নোত্থিতসম চাহে দেখি, সাধু বলে মধুবাণী,
শুষ্ক ধান্যক্ষেত্রে বরষা কে যেন দিল গো আনি।
বলেন, "ভক্ত ত্যজিয়াছ গৃহ লয়ে যেই আশা মনে,
অন্তর্যামী জেনেছে তখনি থাকিয়া হৃদয়াসনে।

যে আসে যে মনে, দেন সযতনে, চিন্তামণি এ ভূমি।
অঙ্গীকৃত হয়েছে তখনি যখনি এসেছ তুমি।
পাবে অচিরাৎ সেই প্রাণনাথ প্রাণাধিকা রাধাসহ
এবে কিছুদিন সুস্থির মনে ব্রজের সঙ্গ লহ।

কর দরশন লীলা-অগণন-চিহ্নিত ব্রজ, তুমি—
'নন্দগ্রাম' 'কাম্যকানন' গোকুল' মথুরাভূমি'।
'মধু'-'নিধুবন' কুঞ্জ কানন দেখিতে পাইবে হেথা—
গুচ্ছে গুচ্ছে ফলেছে মুক্তা ভরিয়া 'মুক্তালতা।

বংশীনিনাদে গলা গিরিশিলা পদচিহ্নিত হয়ে,
অবিশ্বাসীরে বিশ্বাস দেয় এখনো প্রমাণ লয়ে—
নূপুরভঙ্গী ধরিয়াছে ফল, পত্র হয়েছে 'দোনা',
"রাধা-শ্যাম" বলি ডাকে পাখীগুলি, সদা যায় কাণে শোনা;

প্রেমবর্ষণে 'বর্ষাণা' গলে শৈলের তলে থাকি,
'গহ্বর' বনে লীলার চিহ্ন বৃন্দা রেখেছে আঁকি।
'আলতাপাহাড়ী' আলতায় মাখা, 'যাবটে' জটিলা-কুটি,
'ভোজন-থালীতে ভোজনের থালী কাঁদিছে ধূলায় লুটি।

'যমুনাপুলিন' যেথা নিশিদিন আঁখি-নীর আজো বয়—
সে জ্ঞানগুধ্ড়ী'—শ্রীউদ্ধবের জ্ঞানের শিক্ষালয়;
'কালীদহ' আর মন্দবহ যে ধীরসমীরের তীর,
'চীরঘাট' যেথা বস্ত্রহরণ হয়েছিল গোপিনীর।

'শ্রীরাধাকুণ্ড' 'শ্রীশ্যামকুণ্ড' 'সূর্য্যকুণ্ড' আদি—
হয় সব ঠাঁই অনুভব ভাই, ভাগ্য না হলে বাদী।
ব্রজের বনেতে সে মোহন বেণু বাজায় এখনো কালা—
সে শুনিতে পায় গ্রাম্যকথায় কাণে যার আনে জ্বালা।

আছে গিরিরাজ এই ব্রজমাঝ, শিরতাজসম হয়ে
ঝরে অগণন লীলা-নির্ঝর তাঁর সুঅঙ্গ বয়ে।
রাস-উচ্ছ্বাসে বংশীনিনাদ করেছিল যেইখানে,
আজো মুখরিত সে বংশীবটে ত্রসরেণু লীলাগানে।

পেলে পেতে পার শ্রীরাধা-কৃপায় প্রাণবন্ধুর দেখা,
হেন মনে লয় সেই শুভোদয় আছে তব ভালে লেখা।
এসেছ যখন কর দরশন, ভাগ্যবন্ত কবি
যাও এই পথে সতী-জায়া-সাথে, দেখ সে প্রেমের ছবি।"

এই কথা বলি 'মাধুকরী'-ঝুলি খুলিয়া দয়াল সাধু,
দিয়া যান কিছু প্রসাদ-অন্ন অমৃত হতে স্বাদু।
সাধু যান চলে নবাগতে বলে ব্রজের মাধুরী-কথা
চকিতে চপলামালার মতন, হরিয়া হৃদয়-ব্যথা।

ছন্দের মত কথাগুলি তাঁর ঝঙ্কৃত হল প্রাণে,
নরকণ্ঠের ধ্বনি তাহা নয়, হেন অনুভূতি আনে।
উঠি তথা হতে চলে কবিবর আবেশে অবশ হিয়া,
সুচিরশান্তা কান্তার দেহে অঙ্গের ভর দিয়া—

ভাবে গরগর যায় কবিবর "জয়, শ্রীরাধিকে" বলি,
দেখে ব্রজবন পশু পাখীগণ, সকল লীলাস্থলী—
কালের প্রভাবে কেহ বা গুপ্ত কেহ বা প্রকট আছে—
কবির চক্ষে সকলে মূর্ত্ত হয়ে আনন্দে নাচে।

"এস এস" বলি সকলে স্বাগত সম্ভাষা করে যেন,
বলে "হে বন্ধু, আমাদের ভুলে ছিলে এতদিন কেন ?"
বাক্যে মনেতে কাব্যে বা গীতে নারে প্রকাশিতে যাহা—
আজি স্বচক্ষে হেরে কবিবর ব্রজের বনেতে তাহা।

রবির প্রকাশে খদ্যোতমালা হয় নিষ্প্রভ যথা—
দেখে সেইমত বিশ্বের গীত হইয়াছে ম্লান তথা।
হেথা বিরিঞ্চি করেনি সৃজন কোন রূপ কোন রসে ;
ভাগবত ভূমি আছে ধরা চুমি আপনি আপন বশে।

কুঞ্জে কুঞ্জে করিয়া ভ্রমণ খোঁজে কবি শ্যামচাঁদে—
গোপেশ্বরের সম্মুখে বসি কৃষ্ণ চাহিয়া কাঁদে।
অতি মঞ্জুল শ্রীসেবাকুঞ্জে কবিরে হেরিয়া অলি
গুঞ্জরে আসি পুঞ্জে পুঞ্জে পিক ডাকে, "কুহু" বলি।

তরু-লতাগণ করে আবাহন কুশল প্রশ্ন করি
করি কেকারব, নৃত্যোৎসব করে শিখী পাখা ধরি।
আসি পাখীসব করে কলরব, বলে, "কে এলে গো তুমি ?"
"এস এস" বলি বায়ূ যায় চলি কবির অঙ্গ চুমি।

"ধন্য অস্মি" বলি পদতল ধরে শ্যাম তৃণগুলি,
ভকত-অঙ্গে লুটে সুরঙ্গে বৈষ্ণবী ব্রজধূলি :
• যোগ্য অতিথি পেয়ে করে নতি বানর বানরীগণে,
শুক শারী গাছে উল্লাসে নাচে বৈষ্ণব-দরশনে ,

আসি মৃগচয় শুধু চেয়ে রয় প্রকাশি আঁখির ভাষা—
যেন কতদিন ছিল গো তাহারা, লয়ে দরশন-আশা।
ফুল দেয় বাস আর মধুহাস যৌতুক বুকে ধরি,
যমুনার জল হইল উতল পরশন-সুখ স্মরি :

আলোকে বাতাসে উল্লাস ভাসে লইয়া মোনা বাণী—
নারায়ণ মানি অতিথিরে সেবে যেন গো বৃন্দারাণী।
এ হেন সময় যেন মনে হয়, বাঁশী বাজে কোন বনে—
রাস-উচ্ছ্বাস করি সে বংশী ডাকে যেন সখীগণে।

শরতের রাতে যে মধুরাগেতে বেজেছিল বাঁশী আগে,
সেই মাদকতা আনি ব্যাকুলতা কবির চিত্তে জাগে।
সেই প্রিয় সুর ডাকিছে, "বিধুর এস গো, আমার পাশে,
শ্রীরাধিকাসনে আজি এ বিপিনে আছি সখে তব আশে"—

শুনি সে মুরলী, গেল প্রাণ গলি, আর কি থাকিতে পারে।
আজ সেই ডাকে—এতদিন কবি ডাকিয়া ফিরেছে যারে।
চলে সত্বর ধরি সেই স্বর, গরগর প্রাণখানি,
সেবকের সাথে যান বীণা-হাতে সুতবৎসলা বাণী।

গিয়া দেখে কবি অনুপম ছবি, বংশীবটের তলে
করে দিবা-রাস জগন্নিবাস, মিলি সঙ্গিনীদলে।
মিলেছে তথায় চতুঃষষ্টি রস যেন ধরি দেহ,
দিব্যচক্ষে দেখে কবিবর, অন্যে দেখে না কেহ।

কিন্তু এ রূপ নহে সেই রূপ রাধিকায় লয়ে বামে।
শ্রীরাধাই যেন কৃষ্ণ-মূরতি ধরেছে নবীন ঠামে।
'রাধা কি, কৃষ্ণ ?' জাগে এ প্রশ্ন কবির মর্ম্মদেশে,
'কৃষ্ণবেশিনী রাধিকা, কিম্বা কৃষ্ণ রাধিকা-বেশে ?'

বিস্ময়ে চাহি পদ্মারে কহে, "দেখিছ কি কিছু, সতি ?
চিনিতে না পারি, উনি রাধাপ্যারী, অথবা রাধিকাপতি।"
পদ্মা সভয়ে জয়দেবে কহে, "একি দেখি বিপরীত,
তুমি একজন হোথা কি কারণ করিছ নৃত্য-গীত।

শোনো কবিভূপ, অবিকল রূপ, তোমারি কায়ব্যূহ
মোর পানে চেয়ে, হাসিছে বাঁকায়ে বদন-পঙ্করুহ।
একি হল মোর বিকারের ঘোর, দেখি দুইজন স্বামী।
হায়, সতীত্ব হারাইনু বুঝি হেথায় আসিয়া আমি।"

কবিবর বলে "কি কহ, সরলে, ও যে মোর মনোচোর।"
বলে পদ্মিনী "মনোচোর জানি, তবে তব নহে, মোর।"
কেহই কাহারে বুঝাইতে নারে যাহা দেখিতেছে দোঁহে,
আজি রসভূপ ধরি রসরূপ, যুগল রসিকে মোহে।

যে রূপে যাহার রুচি, রসাধার তারে দিল সেই আঁখি,
পাতি কিছুকাল এই মায়াজাল, দিল এই মায়া ঢাকি।
শুধু দেখে কবি গৌর-কৃষ্ণে অতিশয় বিস্ময়ে
নিশ্বাস ফেলি বাঁচিল পদ্মা, না দেখি পতিদ্বয়ে।

স্ফটিকাবরণে নীলমণিসম রাধা-ঢাকা শ্যাম-রূপ—
শুভ্র-জ্যোৎস্না-বিজড়িত শ্যাম জলদের অনুরূপ।
রবিমণ্ডলে স্থির-আঁখি দিলে, সেই শ্যামাভাস আসে,
কনকদ্যুতিমাঝে আকৃতি, তাহে সেই রূপ ভাসে।

'উত্তরকালে এই হব বলে', ইঙ্গিত করে হাসি—
'গীত-গোবিন্দে দিতে গৌরব, গৌর-রূপেতে আসি।'
থাকি কিছুকাল এ রূপে দয়াল, রাধায় লইয়া বামে
দাঁড়াল রূপের বন্যা আনিয়া মধুময় ব্রজধামে।

হইয়া লোলুপ দেখে সেই রূপ কবির সহিত বাণী—
বর্ণমালার ভাণ্ডার তাঁর উজাড় করিয়া আনি।
করিল প্রয়াস লয়ে বৃথা আশ প্রকাশিতে সেই ছবি—
তবু ফুটিল না তার এককণা—লেখনী ফেলিল কবি।

সেই রস-সার, আর রসাধার—যুগলমাধুরীধারা
কবিসহ বাগ্‌দেবীরে ভাসাল তুচ্ছ তৃণের পারা।
চিত্রার্পিতসম আছে চেয়ে—জীবন নাই কি আছে,
নাহি যায় জানা—শ্রীরূপমগ্না পদ্মা দাঁড়ায়ে পাছে।

যুগলে যুগল করে দরশন—ভারতী মূর্ত্তা হয়ে
স্থাপিল কৃষ্ণ-চরণে কিরীট মস্তক হতে লয়ে।
বলে বীণাপাণি, "ওহে, বেণুপাণি, বিজিতা এ তব দাসী
সব ভাণ্ডার করিল উজাড় বর্ণিতে রূপরাশি—

তবু এক কলা হইল না বলা, মোর সব কলাগুলি
স্তম্ভিত হয়ে আজে শুধু চেয়ে বিস্মিত আঁখি তুলি।
তব মাধুর্য্য বর্ণিতে নারে আমার কাব্য কলা
যা ছিল সাধ্য হইয়াছে সব গীতগোবিন্দে বলা।

সুর তাল লয় ছন্দ ও ভাষা চরম ললিত করি
করেছি রচনা—শুধু এককণা তোমার মাধুরী, হরি।
হয়েছে ব্যক্ত হে অব্যক্ত, অখিল রূপের খনি,
সেইটুকু লভি গীত-গোবিন্দ হইয়াছে মহাধনী।

ওই রূপরাশি উঠিছে উথলি রাধা-রাকাশশী চাহি—
দুরাশা আমার, যাব পরপার ভাষা-ভাঙ্গাতরী বাহি।
জ্যোৎস্নারাশি ও কুসুমের হাসি চয়ন করিয়া আমি
মন্দানিলের তূলী দিয়া রূপ আঁকিতে চাহিনু, স্বামী।

ফুটিল না তবু একটি বর্ণ তব বর্ণের মত।
তবু সেই ছবি হেরি সব কবি করিয়াছে মাথা নত।
হে রসসিন্ধু, একটি বিন্দু গীতগোবিন্দমাঝে
রাখিয়াছে কবি, আর বাকী সবি, তবু তাই দেখে লাজে

মৃতবৎ হল অমৃত, মধু তাক্ত হইল ভবে
দ্রাক্ষা পলাল, কর্কশা বলি শর্করা ত্যজে সবে।
ক্রন্দন করে ফল-মাকন্দ, ক্ষীর ঈর্ষাগ্নিতে-জ্বলে,
কান্তা-অধর অনাদরে গেল দানবের গৃহে চলে।

ওগো গোবিন্দ, গীত-গোবিন্দে তুমিই দিয়েছ মান,
"দেহি পদপল্লবমুদারম"—এ তোমারি অবদান।
অপরাধ সব ক্ষমিও ক্ষান্ত, ভ্রান্ত চিত্তে মোর
পশি ওই রাঙ্গা চরণের আলো কেটে গেল মোহ-ঘোর।

অন্তর্হিতা হইলেন বাণী—ব্রহ্মলোকেতে গিয়া,
বিধির মানস সরোবরে বহে প্রেম-বিগলিত হিয়া।
তরলিতা বাণী দেখিয়া বিধাতা সে সারস্বত জলে
সন্তর্পণে তুলিয়া রাখিল বৈধী কমণ্ডলে।

বিধিনিন্দুক মন্দমতি ও অনাদি-বহির্মুখে
বঞ্চিত করি স্পর্শাধিকারে, থুইল প্রেমিক-বুকে।
তীর্থরাজেরে দিল এক ধারা রসিক ভক্ত তরে,
গঙ্গা-যমুনা-সম্পুটে রাজা রাখিল গোপন করে।

বিধি-করঙ্গে রহে সুরঙ্গে বাণী সুরধুনীসনে—
কাটে দিন অতি রভসে রহস্-লীলাকথা-আলাপনে।
উছলিত ভাষা, হয় 'দেশ' 'আশা' 'বিভাস' ও 'রামকিরী',
'মেঘমল্লার' 'মালব' প্রভৃতি স্বরগ্রাম রহে ঘিরি।

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ-প্রশস্তি

সিংহীর ক্ষীর, সেই পূত নীর—'গীত-গোবিন্দ' নাম,
ব্রহ্মার হেম করোয়া-গর্ভে, করে সুখে বিশ্রাম।
সেই রস-সার গীত-গোবিন্দ গঙ্গাধারার প্রায়
ভগীরথরূপী ভক্তগণের আহ্বানে এ ধরায়

নেমে এসে প্রেম-পারাবার-পানে চলে উল্লাসভরে—
ভক্তেরা রাখে নিজ নিজ হৃদি-স্বর্ণপাত্র ভরে।
এ বাণী তটিনী লীলা-লাবণ্য সুর-তরঙ্গে ভরা,
সুরধুনীসম হরিছে জীবের মৃত্যুভীতি ও জরা।

এই আদিরস, বিধি যার বশ, বিষরস কামীজনে :
বিনা অধিকার সাধ্য কাহার এ রস আস্বাদনে।
নীলকণ্ঠও রাখেন কণ্ঠে, ভোক্তা কেবল হরি ;
শুক-নারদাদি ফিরে কাঁদি কাঁদি এক কণা হৃদে ধরি।

নয়নের পথে পিয়ে গোপীগণ এ মধুরস-ধারা—
দেহস্মৃতি নাই, এই রস তাই লালন করিছে তারা।
গীত-গোবিন্দ সুখের কন্দ অভিনব ব্রজবনে,
জাগে 'রাগানুগা'-ভজন-ভূমিতে রসিকাগণের মনে।

চিরবসন্ত করি জীবন্ত রেখেছে এ প্রেম-তরু,
তাই এর ছা'য় দাঁড়ালে জুড়ায় জীবের জীবন-মরু।
ছন্দের শাখে ফুটে লাখে লাখে রসসার ব্রজবাণী,
শ্রীরাধা-মুকুলে বুলে কুতূহলে মধুকর-বেণুপাণি—
কোমল কান্ত এই পদাবলী—"গীত-গোবিন্দ" গাথা
থাক্ চিরকাল হয়ে মণিমাল প্রেমিকের গলে গাঁথা।
অরসিক—যার নাই অধিকার, পরশিলে এই মালা
মণি ফণী হয়ে দংশি ঢালিবে কাম-কামনার জ্বালা।

পুষ্পিকা

কবিকুল-কৈরব-শশধর জয়দেব মহামতি
উজ্জ্বলরস-সাহিত্যে পূজি' পাইলেন ব্রজপতি।
বাসনা আমার সে পথে যাবার, কিন্তু বৃথা সে আশা
নাই প্রেম প্রীতি, নাই সে শক্তি, নাই ভাব, নাই ভাষা।
তবে শুভ আশা জেগেছিল মনে, সেইটুকু স্মরি হরি
নিজেই রচিল এ "বাণী-বিজয়" আমারে যন্ত্র করি।
তাঁর কৃপা হলে, শিলা ভাসে জলে, মূক হয় শতমুখ—
চাক্ষুষ মোরে দেখাইল হরি, এইটুকু মোর সুখ।
রাজ-অধিরাজ তৃণেরেও আজ দিল সেবা-অধিকার
এমন করুণা না থাকিলে, তবে কে গুণ গাহিত তাঁর।
মাতা হয়ে নিল অঙ্কে তুলিয়া, গুরু-রূপে দিয়ে দেখা,
মুছিল ললাট-পটল হইতে কঠিন ভাগ্যরেখা।

"শ্রীরামবল্লভাশরণ" শ্রীগুরু 'অবধ'বিহারী প্রভু
দিয়াছেন আশা, পদতলে বাসা দিবেন কভু-না-কভু।
'জীবনবালা'য় "প্রেমমঞ্জরী" নামে নিল পদে তুলে,
তাই মনে হয়, শেষের সময় রবে না দয়াল ভুলে।

—স মা প্ত—

★চিহ্নিত শব্দগুলির অর্থ ও লক্ষণ

(নিম্নলিখিত সংস্কৃতশ্লোকগুলি শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপাদের 'উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে উদ্ধৃত)

পৃষ্ঠা ৯ *চিহ্নিত শব্দ – নীলিমা (নীলরাগ) —

ব্যয়সম্ভাবনাহীনো বহির্নাতিপ্রকাশবান্ ।
স্বলগ্নভাবাবরণো নীলীরাগঃ সতাং মতঃ ॥১

" ১০ " রক্তিমা রাগ —

রাগঃ কুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাসম্ভবো রক্তিমা মতঃ ॥২

" ১০ " স্থায়ী ভাব—

স্থায়ী ভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ ॥৩

" ১০ " সঞ্চারী ভাব—

অত্র সঞ্চারিণো ব্যাধিঃ শঙ্কাসূয়া শ্রমঃ ক্লমঃ ।
নির্ব্বেদৌৎসুক্যদৈন্যানি চিন্তানিদ্রাপ্রবোধনম্ ।
বিষাদো জড়তোন্মাদো মোহমৃত্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৪

" ১০ " মঞ্জিষ্ঠারাগ—

অহার্য্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা ।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠরাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা ॥৫

" ১৪ " বিপ্রলব্ধা—

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে ।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ ।
নির্ব্বেদচিন্তাখেদাশ্রু-মূর্চ্ছানিশ্বসিতাদিভাক্ ॥৬

পৃষ্ঠা ২৪ ; *চিহ্নিত শব্দ—দক্ষিণা—

অসহা মাননির্ব্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী।
সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥৭

„ ২৪ „ বামা—

মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা।
অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে ॥৮

„ ২৮ সমর্থা রতি—

কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে ॥৯

„ ২৮ „ সমঞ্জসা রতি—

পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।
কচিদ্ভেদিতসম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা ॥১০

„ ২৮ „ সাধারণী রতি—

নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা।
সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা ॥১১

„ ৬৫ „ খণ্ডিতা—

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।
এষা তু রোষনিশ্বাস-তূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ ॥১২

„ ৬৯ „ কলহান্তরিতা—

যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিশ্বসিতাদয়ঃ ॥১৩

(সংস্কৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ।)

(১) যে রাগের ব্যয় সম্ভাবনা নাই, যাহা বাহ্যে অতিশয় প্রকাশবান হয় এবং স্বলগ্নভাবকে আবরণ করে, পণ্ডিতগণের মতে তাহার নাম নীলীরাগ (এই রাগ চন্দ্রাবলী এবং শ্রীকৃষ্ণে দৃষ্ট হয়) (২) কুসুম্ভ এবং মাঞ্জিষ্ঠসম্ভব রাগকে রক্তিমা বলে। (৩) শৃঙ্গার রসে মধুরা রতিকে স্থায়িভাব বলে। (৪) পূর্ব্বরাগস্বরূপ রতি বিষয়ে ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ, মৃত্যু প্রভৃতি সঞ্চারিভাব সকল উদয় হয়। (৫) যে রাগ কোন প্রকারেই নষ্ট হয় না, অন্যকেও অপেক্ষা করে না, নিরন্তর স্বীয় কান্তি দ্বারা বৃদ্ধিশীল থাকে, তাহাকে মাঞ্জিষ্ঠ বলে। যেমন শ্রীরাধামাধবের পরস্পর রাগ, তদ্রূপ। (৬) সঙ্কেত করিয়া যদি প্রাণনাথ অনাগত হন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যথিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলব্ধা কহেন। নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি বিপ্রলব্ধা নায়িকার চেষ্টা। (৭) যে নায়িকা মাননির্ব্বন্ধে অর্থাৎ মানগ্রহণে অসহা ও নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য প্রয়োগ করে এবং ঐ নায়কের স্তববাক্যে প্রসন্না হয়, তাহাকে দক্ষিণা কহে। (৮) যে নায়িকা মানগ্রহণার্থ সতত উদ্‌যুক্তা, কিন্তু ঐ মানের শৈথিল্য ঘটিলে কোপনা হয় এবং নায়ক যাহাকে ভেদ অর্থাৎ বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকেই বামা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়, পরন্তু ঐ বামা নায়কের

প্রতি প্রায়ই কঠিনা হয়। (৯) সাধারণী এবং সমঞ্জসা হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ সম্ভোগেচ্ছা যে রতিতে তাদাত্ম্য অর্থাৎ নায়ক নায়িকাতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সমর্থা। (১০) যাহাতে পত্নীত্বাভিমান বুদ্ধি হয়, যাহা গুণাদিশ্রবণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যাহাতে কখন কখন সম্ভোগের তৃষ্ণা জন্মায়, সেই রতির নাম সমঞ্জসা। (১১) যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, প্রায় কৃষ্ণদর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং যাহা সম্ভোগেচ্ছারই নিদান, তাহাকে সাধারণী রতি বলে। (১২) পূর্ব্বসঙ্কেতিত কাল ব্যত্যয় করিয়া প্রিয়তম অন্য প্রেয়সীর সহ নিশাযাপন করত তদীয় ভোগচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক যদি প্রাতঃকালে সমাগত হয়েন, তদ্দর্শনে পূর্ব্ব নায়িকা খণ্ডিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ইত্যাদি খণ্ডিতা নায়িকার চেষ্টা। (১৩) যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলা যায়। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ প্রভৃতি কলহান্তরিতা নায়িকার চেষ্টা।

সবিনয় নিবেদন

পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় এই 'বাণী-বিজয়ের' সুবিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া নিজ বৈষ্ণবোচিত মহান্ ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃত রসজ্ঞ, মহাচেতা ও যথার্থ সাহিত্যসেবী বলিয়াই অপরের লেখার আদর দিতে জানেন। গোস্বামিপাদ মহাকবি শ্রীশ্রীতুলসীদাসজী বলিয়াছেন,—"যে পর-ভনিত শুনত হরষাহিঁ তে বরপুরুষ বহুত জগ নাহিঁ।" (অপরের কবিতা শুনিয়া অকপটে আনন্দ প্রকাশ করেন, এরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষ জগতে অধিক নাই)। ঐরূপ পুরুষকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিয়া পুনরায় বলিয়াছেন—"সজ্জন সুকৃত সিন্ধুসম কোঈ, দেখি পুরবিধু বাড়হিঁ জোঈ।" (জগতের সমস্ত নদ-নদীর জল এবং ভগবদ্দত্ত অজস্র আকাশের জল স্বয়ং লাভ করিয়াও সমুদ্র যেমন কিঞ্চিন্মাত্র স্ফীত হয় না, কিন্তু সুদূরস্থিত চন্দ্রমাকে ষোল কলায় পূর্ণ হইতে দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে. সজ্জনগণের প্রকৃতিও ঠিক সেই প্রকার)। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রসিকবাবুর ঋণ পরিশোধ করিবার সাধ্য আমার নাই। এই মহাপুরুষ জ্ঞান-সিন্ধু এবং ঔদার্য্যেও সমুদ্রেরই ন্যায়। অতি তুচ্ছ এবং তাঁহার উপকারের তুলনায় যাহা এক কণিকামাত্র, সেই কৃতজ্ঞতাটুকু লইয়া তাঁহার চরণ-কমলে অর্পণ করা ছাড়া আমার ন্যায় নগণ্যা পূজারিণীর আর কোন সাধ্য নাই। আমার বিশ্বাস, সেই মহানুভব বৈষ্ণবাচার্য্য ইহা প্রত্যাখ্যান করিবেন না।

এই বাণী বিজয় মুদ্রণ সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই গ্রন্থ মুদ্রণ-বিষয়ে তিনি যদি ঐরূপ উৎসাহদান না করিতেন, তবে ইহা ছাপাইবার উৎসাহ আমার কস্মিনকালেও হইত না। সুতরাং বাণী-বিজয়ের প্রকাশ-ব্যাপারে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উদ্যোক্তা।

দ্বিতীয় উদ্যোক্তা—এই গ্রন্থ-সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয়ভার যিনি বহন করিয়াছেন। কটক জেলার (উড়িষ্যা) অন্তর্গত 'ঢেঙ্কানাল' নামক সামন্ত-রাজ্যের বর্ত্তমান রাজমাতা (ভূতপূর্ব্ব পুণ্যাত্মা রাজা স্বর্গীয় সুরপ্রতাপ মহেন্দ্র-বাহাদুরের সাধ্বী ও ভক্তিমতী পত্নী এবং বর্ত্তমান তরুণ রাজা শ্রীশ্রীমান্ শঙ্করপ্রতাপ মহেন্দ্র বাহাদুরের জননী) পরম প্রীত্যাস্পদ রাণী শ্রীশ্রীমতীকৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া দেবী এক প্রকার স্বেচ্ছায় এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়া আমার নিকট ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। তাঁহার অর্থ সাহায্য-ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ আমার জীবদ্দশায় হয়ত প্রকাশিত হইত না।

লেখিকার শত সহস্র ত্রুটি ও অক্ষমতা থাকিলেও এই 'বাণী-বিজয়' কাব্য শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের নাম যশাদিতে অলঙ্কৃত, কাজেই ইহা ভগবদ্ভক্তগণের পঠন, শ্রবণ ও মননযোগ্য বিষয়। কাচ কাঞ্চনের সংশ্রবে আসিয়া মরকত-দ্যুতি লাভ করে, নীর ক্ষীরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ক্ষীরবৎ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমার অযোগ্য রচনাও হরিকথা-সংসর্গে হরিভক্ত-গণের নিকট আদরণীয় হইবার দাবী রাখিতে পারে।

শ্রীশ্রীমতী রাণী কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া দেবী সত্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়া ! তাঁহার স্বাভাবিক সদ্‌গুণাবলীর সহিত এই সদনুষ্ঠানটি সংযোজিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহাদের প্রিয়-ভক্তা প্রতি আরও প্রসন্ন হইলেন। আমার গোলোকগতা জননীর পরম স্নেহপাত্রী এই মহানুভাবা দেবী পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া চিরকল্যাণে দীর্ঘজীবন যাপন করুন, ইহা আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।

এই 'বাণী-বিজয়' মুদ্রণকার্য্যে তৃতীয় উদ্যোক্তা স্নেহাস্পদ প্রকাশক শ্রীমান্ কালিদাস দত্ত। শ্রীমানের সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া কঠিন হইত। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমান্ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক ছাপার প্রত্যেক কার্য্য দেখিয়া লইলেও অনুন্নত সংস্করণ বলিয়া অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে ! পাঠক-পাঠিকাগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীমান কালিদাস (স্বর্গীয় কাশিমবাজারাধিপতি রাজর্ষি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সদরের ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ মজিলপুর-নিবাসী স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের একমাত্র পুত্র) এই গ্রন্থের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া ইহা প্রকাশ করিলেন। আমার এই গ্রন্থের সংশোধনকার্য্যে শ্রীমান্ প্রধান সহায়ক এবং স্থলে স্থলে স্বয়ং সংশোধক। শ্রীমান্ কবিহৃদয়, কাজেই আমার প্রত্যেক রচনাটি শ্রীমানের দ্বারা আস্বাদিত হইয়াছে। শুধু রচনা করা ছাড়া আমাকে আর কোনও পরিশ্রম করিতে হয় নাই। এজন্য আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করা ছাড়া আমি আর অধিক কি জানাইব।

অন্তরের আনন্দ স্বয়ং অন্তর্য্যামী জানিয়া শ্রীমান্‌কে পুরস্কৃত করুন।

এই বাণী-বিজয়ের যিনি প্রকৃত স্রষ্টা, সেই ভগবান্ হৃদয়-বিহারী শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম, জ্ঞানদায়িনী বাগ্‌দেবীর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম, আমার মহীয়সী বিদুষী হরিভক্তি-সুধা-তরঙ্গিণীসদৃশী গোলোকগতা জননীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

বৃন্দাবন
শ্রীশ্রীপঞ্চমী, মাঘ
সন ১৩৪৪

ভক্তপদ-রজাশ্রিতা
শ্রীমতী জীবনবালা দেবী